KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol & Number ৫৩/৩ ৫৩/৪ ৫৩/৫-৬ ৫৩/৮	Year of Publication : আষাঢ় ১৩৯৯ // July 1992 শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৯ // Aug 1992 ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৯ // Sep-Oct 1992 অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ // Dec 1992
	Condition : Brittle Good
Editor আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৩ জুলাই, ১৯৯২

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রাহুল সাংকৃত্যায়নের ধ্যানধারণার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ড. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের প্রজ্ঞাদীপ্ত এবং তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ — ''বুদ্ধ থেকে মার্কস : রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিযাত্রা''।

সোভিয়েত-অবসানোত্তর পৃথিবীতে এক মেরু বিশ্বের সম্ভাবনা, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান এবং নিজেটি তত্ত্বের বাতিল আবহাওয়ায় ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি কতখানি বাস্তবানুগ ? — এই নিয়ে অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায়ের নিবন্ধ — ''নতুন বিশ্বরাজনীতি ও ভারত''।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের পরিণতি বাংলার সমাজজীবনে কী রূপ নিয়েছে তাই নিয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক রচনা — ''জাত বৈষ্ণব কথা''।

বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদের ভাষায় সমসাময়িক রাজনীতি কীভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণাধর্মী আলোচনা।

সুভো ঠাকুরের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীপান্থ লিখেছেন বিশেষ রচনা।

সৈয়দ মুজতবা আলীকে নিয়ে একটি ''সম্পূর্ণ গবেষণাকর্ম'' পর্যালোচনা করেছেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় রিভিউ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখিকার গল্প এবং উপন্যাস।

মূলভাষা থেকে চীনা কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গ।

জীবনানন্দ দাশের ''বোধ'' কবিতার মর্মবাণী অনুধাবনে একটি ঐকান্তিক প্রয়াস।

উডকাট ব্লকের বিলুপ্ত শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা।

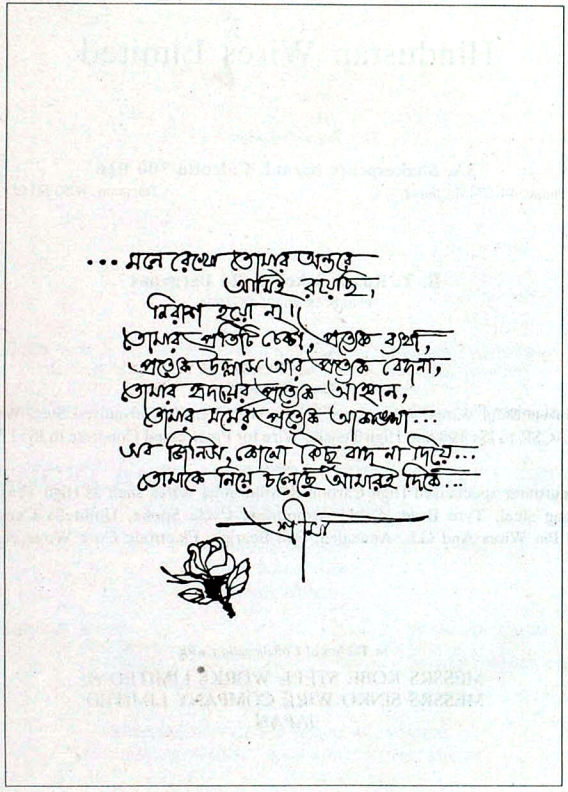

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৩

জুলাই ১৯৯২

আষাঢ় ১৩৯৯

বুদ্ধ থেকে মার্কস : রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিযাত্রা　রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য　১৬৯
নতুন বিশ্ব রাজনীতি এবং ভারত　জয়ন্তকুমার রায়　১৮৫
কবিতায় রাজনীতি : বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদ　সুজিৎ ঘোষ　১৯৫
জাত বৈষ্ণব কথা　অজিত দাস　২০৬

কবিতা

সপ্তর্ষির হুইসিল　বিরাম মুখোপাধ্যায়　১৮১
ব্যর্থ পরিক্রমা　নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার　১৮২
রোদের জলের নদী　মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়　১৮৩
পক্ষহীন দূরত্ব রেখা　হোসাইন কবির　১৮৪

গল্প

নিছক একা নয়　সুধাংশু ঘোষ　১৯০

গ্রন্থ সমালোচনা

সৈয়দ মুজতবা আলীকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গভেষণাকর্ম　সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত　২১৯
মাফরুহা চৌধুরীর গল্প ও উপন্যাস　শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়　২২২
গণতন্ত্রীকরণের পথে সার্কভুক্ত দেশগুলির স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা　অশোককুমার মুখোপাধ্যায়　২২৪
চীনা কবিতার উজ্জ্বল রূপান্তর　দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়　২২৫

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

সুভো ঠাকুর　শ্রীপান্থ　২২৮
উডকাট : একটি লুপ্ত শিল্পকর্ম　জয়ন্ত বাক্‌চি　২৩১
বোধির প্রান্ত ছুঁয়ে যে 'বোধ'　হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়　২৩৬

মতামত

১৩৫০-এর মন্বন্তর, বিক্রমপুর ঢাকা　দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়　২৪২
দি মারজিনাল মেন-এর অনেক আগে লেখা হয় *উদ্বাস্তু*　অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়　২৪৪
নারী পুরুষের বুদ্ধির তারতম্য　ভাস্কর বিশ্বাস　২৪৫
এক বিশ্বরাষ্ট্র ও বিশ্ব সরকার　মিলন মজুমদার　২৪৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতি নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি - ৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলি - ১৩

দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭

শিল্প পরিকল্পনা　**রনেনআয়ন দত্ত**

নির্বাহী সম্পাদক　**আবদুর রউফ**

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TO-MORROW D. T. M. OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
MANUFACTURING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANT
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION
- AND GOVERNMENT PROJECTS

D. T. M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

CIVIL ENGINEER, CONTRACTORS AND MASTER DREDGERER

City Office:
59B CHOWRINGHEE ROAD
(5th Floor)
CALCUTTA-700 020
Phone: 40-3165, 40-3093
Telex: 021-5294 ANIP IN

Registered Office:
1, MANGOE LANE
(2nd Floor)
CALCUTTA-700 001
Phone: 20-0194
Cable: COLBEAM

25 YEARS' DEDICATED SERVICE TO THE NATION

বুদ্ধ থেকে মার্কস : রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিযাত্রা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

গরমিলে মিলাইয়া

রাহুল সাংকৃত্যায়নের (১৮৯৩-১৯৬৩) অন্তর্জীবনের চারটি পর্ব তো স্পষ্টই চোখে পড়ে : বৈদান্তিক, আর্যসমাজী, বৌদ্ধ ও মার্কসবাদী (শুধু পাঠশালার মার্কসবাদী নন, প্রত্যয়ে ও কর্মে কমিউনিস্ট)।[১] প্রথম দুটি পর্ব পেরিয়ে আসার পর তিনি কোনদিন সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকান নি। কিন্তু কমিউনিস্ট হওয়ার পরেও তিনি বুদ্ধের চেলাই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় :[২]

> বুদ্ধ ছিলেন কালবাদী—দেশ, কাল, ব্যক্তি দেখে তিনি নিজের সম্পদ দিতেন। হাওয়ায় তলোয়ার চালানো তিনি পছন্দ করতেন না, তাঁর এই নগণ্য শিষ্য রাহুলেরও ঐ একই কথা—হ্যাঁ, শি ষ্য তা র অ ধি কা র আ মি ছা ড়ি নি, বরং "আমার উপদেশিত ধর্মকে ভেলার মতো জানবে, তা পার হওয়ার জন্যে রয়েছে, বয়ে চলার জন্য নয়" ['মজ্ঝিম নিকায়']—এই উপদেশ পালন করতে করতে আমি ক্ষণিক (=দ্বন্দ্বাত্মক) অন্-আত্মবাদ থেকে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদে পৌঁছেছি। [এখানে ও অন্যত্র জোর দেওয়ার জন্যে হরফের মধ্যে ফাঁক দেওয়া হয়েছে—রা. ভ.]

১৯৪২-এ এই ছিল রাহুলের আত্মপরিচয়। বুদ্ধ ও মার্কস—দুজনের দিকেই আমরণ তাঁর ছিল সমান টান।

শঙ্কর, রামানুজ ইত্যাদি বৈদান্তিক গেলেন, স্বামী দয়ানন্দ গেলেন, রইলেন তবু বুদ্ধ। কেন? কিসের ভিত্তিতে রাহুল মেলালেন বুদ্ধ আর মার্কস-এর ভাবজগৎকে—অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও যাঁদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় ২৪০০ বছর? ঐ দুই কালপুরুষের মধ্যে সত্যিই কি মেলবার কোনো জায়গা আছে? নাকি, মার্কস-এর সঙ্গে ফ্রয়েড বা সার্ত্র বা দ্য সোস্যুর-কে একত্র করার মতো এও একটা সাময়িক বা ব্যক্তিগত খেয়াল?

একই নদী : দুই ঘাট?

এমনিতে বলা বাহুল্য, তবু দেখে-ঠেকে মনে হয়, একটা ব্যাপার গোড়াতেই ঠিকমতো বোঝা চাই। বৌদ্ধমতের অনেক কিছুই মার্কসবাদীরা মানবেন না। তেমনি মার্কসবাদের বহু তত্ত্বেই বৌদ্ধরা আপত্তি করবেন। তবু প্রশ্ন ওঠে : আইডিআ-র ইতিহাসে একই নদীর আলাদা দুটি ঘাট বলে কি তাদের সনাক্ত করা যায়? আর অমিলের দিক বাদ দিলেও মিলের কোনো (বা কোনো কোনো) দিক আছে কি, যা দিয়ে পরস্পরের পূরণ হতে পারে? যদি তা-ই হয়, তবে কি বৌদ্ধমতের আজও কিছু দেওয়ার আছে?

ঘটনা এই যে, কয়েকটি ব্যাপারে বুদ্ধ-মার্কসকে একঠাঁই করার কাজে রাহুল নেহাতই একা বা অনন্য নন। সে-ঝোঁক দেখিয়েছেন আরও কেউ কেউ। তারও একটা 'বিচ্ছিন্ন প্রবাহ' আছে। রাহুলের সূত্রেই এ-বিষয়ে খানিক আলোচনা করা যেতে পারে।

ক্ষণিকবাদ ও অন্-আত্মবাদ

এ বাবদে একটা কারণ তো রাহুল নিজেই বলেছেন : বুদ্ধের কালবাদ তথা ক্ষণিকবাদ, অর্থাৎ শাশ্বত, চিরন্তন কোনো সত্যে বুদ্ধের বিশ্বাস ছিল না। হেগেল ও মার্কস-এর দর্শনেও দ্বান্দ্বিকতার প্রথম সূত্রটি তা-ই : যা কিছু আছে তার সবই পরিবর্তনশীল। এর থেকেই রাহুল হয়তো সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন : তাহলে সমাজও বদলায়, বদলাবে। বুদ্ধের সময় থেকে কালপ্রবাহে তা আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে না। তত্ত্বের দিক দিয়ে হেগেলও সে-কথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন একজায়গায়। প্রুশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন ইতিহাসের সমাপ্তি বলে। (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ও পূর্ব ইওরোপের দেশে-দেশে হালের প্রতিবিপ্লবের পর, মার্কিন-জাপ আমলা-ভাবুক শ্রীযুত ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা সেই পুরনো, বাস্তবে-বাতিল, প্রমাণে-অচল ধারণাকেই নতুন মলাটে মুড়ে আবার বাজারে ছেড়েছেন)। তেমন কোনো জায়গায় থামতে রাজি হন নি রাহুল। বরং সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের পর্বকেও ক্ষণিক বলে বুঝে নিয়েছিলেন।

এই সূত্রেই, নিজের দিকে তাকিয়েও হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল : বুদ্ধ থেকে হেগেল, আবার হেগেল থেকে মার্কস যেমন চিন্তার জগতে নিরন্তর এগিয়ে চলার ঘটনা, তেমনি বৌদ্ধ রাহুল থেকে তাঁকেও এগোতে হবে কমিউনিস্ট রাহুল হওয়ার দিকে। দার্শনিক ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার শিক্ষা এই ভাবেই তাঁর জীবনের দিক্‌নির্দেশ করেছিল।

এ-ই কিন্তু সব নয়। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বা হেগেলের দ্বান্দ্বিকতাকে স্বীকার করেন—এমন লোক তো অনেকেই আছেন। শুধু তার থেকেই তো সবাই মার্কস-এর পথে আসেন না। তার জন্যে চাই আরও কিছু। তাই এও দেখার যে, ক্ষণিকবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাহুল বলেছিলেন অন্-আত্মবাদের কথা। ভাবজগতের ইতিহাসে এই অন্-আত্মবাদ এক কালান্তরের সামিল। পুবে বা পশ্চিমে, বুদ্ধের আগে কেউ এমন দুঃসাহসী কথা বলেন নি।[৩] নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিকতা (=বেদের প্রামাণ্যে অনাস্থা) বুদ্ধের আগে ও পরেও ছিল, কিন্তু দেহের অন্তর্নিহিত (sub-stance বলতে মূলে তা-ই বোঝায় : কোনো কিছুর নিচে যা দাঁড়িয়ে আছে) আত্মাকেই নাকচ করে দেওয়াটা সত্যিই এক বিপ্লব। মার্কস এ-ক্ষেত্রে বুদ্ধেরই উত্তরসূরি। ক্ষণিক অন্-আত্মবাদীর পক্ষে তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হওয়াটা আর অল্প কয়েকটি ধাপের ওয়াস্তা।

সে-ছাড়াও অন্-আত্মতার অন্য একটা তাৎপর্য আছে। মানুষের সামাজিক-আর্থিক জীবনে যদি এটি প্রয়োগ করা হয়, তবে তার ক্রান্তীয় দিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

অন্-আত্মবাদ থেকে কমিউনিজম

বুদ্ধ কেন অন্-আত্মবাদী? এর একটা চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন বৌদ্ধ শাস্ত্র-বিশারদ রুশ পণ্ডিত ফিওদর চেরবাট্স্কয় (চেরবাট্স্কি)। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল এই :[৪]

> আত্মা আছে ও ব্যক্তিস্বরূপ [পারিভাষিক নাম : পুগ্‌গল (পালি), পুদ্‌গল (বৈদিক)] আছে—এসব মেনে নেওয়া, বুদ্ধের ধারণায়, শুধু যে নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে নি তা-ই নয়, সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পথে প্রধান অন্তরায়। আত্মাকে নাকচ করার মধ্যেই বুদ্ধ দেখেছিলেন তাঁর মতবাদের মূল লক্ষণ আর অন্য সব মতবাদের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠতা। যেখানে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে, সেখানেই থাকে তার মালিকানার সম্পত্তি; যেখানেই "আমি" আছে, সেখানেই আছে "আমার"; আর যেখানেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে সেখানেই নিঘৃণ দেখা দেবে কোনো-না-কোনো চেহারায় তার প্রতি অনুরাগ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি এই আসক্তিই সব অসজ্জনের মূল, প্রতিটি ব্যক্তিগত কাজ তথা সব সামাজিক অন্যায়ের মূল। এইভাবে আত্মার অস্তিত্বকে নাকচ করে দিয়ে বৌদ্ধ দর্শন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে নাকচ করার এক সুগভীর দার্শনিক ভিত্তি জোগায়। যখন খোদ ব্যক্তিস্বরূপ বলেই কিছু নেই, সেখানে আর কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সম্ভব? তাই সত্যিকারের বৌদ্ধ একমাত্র তিনিই যিনি চিরতরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করেছেন—শুধু সম্পত্তিই নয়, পরিবার-বাড়িঘর ইত্যাদিও। বিশ্বের সমস্ত ধর্মের ইতিহাসে, খ্রিস্টধর্মে ও ইসলামে, প্রায়শই এমন মতবাদ পাওয়া যায় যা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নাকচ করে ও উপদেশ দেয় যে এটা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে আমূল আলোচনা আছে বৌদ্ধমতেই।

মনে রাখা দরকার, চেরবাট্স্কয় কোনদিনই মার্কসবাদী ছিলেন না। দার্শনিক মতবাদে তিনি ছিলেন কান্ট্‌পন্থী। অতীতের কোনো দর্শনের মধ্যে উত্তরকালের চিন্তার প্রতিরূপ দেখায় তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল।[৫] কমিউনিজম্-এর বা, আরও আবছা কথায়, সমাজবাদের দিকে তাঁর বিশেষ কোনো ঝোঁক ছিল বলেও মনে হয় না (যদিও আমরণ [১৯৪২] তিনি সোভিয়েত দেশেই থেকে গিয়েছিলেন)। তবু, নভেম্বর বিপ্লবের দু বছর পরে (১৯১৯), কথাগুলো লেখার সময়ে, হয়তো তাঁর মনে লেগে ছিল সেই ভাবাদর্শের রঙ। যা-ই হোক, অন্-আত্মবাদ যে বৌদ্ধ দর্শনেরই নামান্তর—এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। তার থেকেই চেরবাট্স্কয়-এর বক্তব্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই বেরিয়ে আসে। অবশ্যই এ-ব্যাখ্যান খুবই অভিনব আর মৌলিক। আর কারও মাথায় তা খেলে নি। (দার্শনিক ও ভাষ্যকাররাও যে তাঁদের কালেরই সন্তান—এই সত্যটি এর থেকেও বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়)।

রাহুল ছিলেন কমিউনিজম ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অনুরাগী, আবার চেরবাট্স্কয়-এর সাক্ষাৎ ছাত্রও (মাস্টারমশাইও ছিলেন শিক্ষার্থীর গুণগ্রাহী)।[৬] রুশ বিদ্বানের এই ব্যাখ্যা তাই হয়তো তাঁর অজানা ছিল না। এর ভেতর দিয়েই দর্শন আর আর্থিক-সামাজিক স্থিতির একটা ভাবসূত্র গড়ে উঠেছিল রাহুলের মনেও। অন্-আত্মবাদ আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ—বিষয়দুটি গাঁথা পড়েছিল এক বঁড়শিতে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

ইওরোপের কোনো কোনো মার্কসবাদীও নানা প্রসঙ্গে বুদ্ধের কথা এনেছেন। যেমন, প্রবীণ ঐতিহাসিক ভিক্টর কির্নান (জ. ১৯১৩)। নামে আইরিশ, শিক্ষা ইংল্যান্ডে, অনেক বছর থেকেছেন ও পড়িয়েছেন ভারতেও। ভালো উর্দু জানতেন, ইকবাল, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ প্রমুখের কবিতার তর্জমাও করেছেন অনেক। দর্শনের সূত্রেই তিনি কিছুকাল আগে যুক্ত করেছেন বুদ্ধের ও মার্কস-এর চিন্তাকে—সম্পূর্ণ অন্য এক দিক থেকে (রাহুলের মতামত হয়তো তাঁর জানা নেই)। কির্নান লিখেছেন :[৭]

> এশিয়ার চূড়ান্ত প্রজ্ঞা, বৌদ্ধ অধিবিদ্যা (মেটাফিজিকস্) আমাদের বিচ্ছিন্ন তবু অসম্পূর্ণ স্বসত্তা (সেলফ্)-র কূটাভাস (প্যারাডক্স) সমাধান করেছিল 'স্বসত্তা'র চেতনাকেই বিভ্রম (ইলিউশন) বলে বাতিল করে দিয়ে, আর সব 'যথার্থ' অস্তিত্বকে একই একতা (ওয়ান ইউনিটি)-র অংশ হিসেবে দেখে। পশ্চিমী চিন্তার চূড়ান্ত কীর্তি মার্কসবাদ তার সঙ্গে একমত—অন্তত [এই দিক দিয়ে যে মানুষকে পরস্পর বিযুক্ত পরমাণু হিসেবে না গণ্য করে তাকে সর্বদাই দেওয়া-নেওয়ায় রত সত্তা হিসেবে গণ্য করে, আর এই অর্থে প্রত্যেক সত্তাকেই অসীম তথা সসীম (হিসেবে গণ্য করে)।

পরিভাষার পোশাক ছাড়লে এর মানে দাঁড়ায় :

> সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টি (-আলাদা আলাদা) তার আশ্রয় খুঁজে পায়। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির কথা নিশ্চয়ই ভাবা যেতে পারে, কিন্তু সেটা দেখার ভুল—দড়িকে সাপ ভাবার মতো। সমষ্টি ছাড়া ব্যষ্টি বলে কিছু নেই। তবে সমষ্টির (বা অসীমের) মধ্যে ব্যষ্টি (বা সসীম) নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সমষ্টির সঙ্গে যোগ হারিয়ে গেলে ব্যষ্টির কোনো সত্যিকারের সত্তা থাকে না। বিশ্বজগতের সব বস্তু—জল-বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি—গড়ে উঠেছে পরমাণুর সমবায়-বিন্যাসে। আলাদা আলাদা পরমাণু হিসেবে কিন্তু তাদের কোনো সার্থকতা নেই। এই অর্থেই বলা যায়, তাদের কোনো স্বসত্তা নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অংশ বা উপাদান হিসেবেই তাদের অস্তিত্ব বাস্তব। তেমনি, মানুষ মানেই সামাজিক জীব। প্রত্যেকে যে যার মতো কাজ করছে, একে অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে তার ফল। নিরন্তর এই দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়েই মানুষের প্রজাতি-সংরক্ষণ হয়ে চলে (আর সেই সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের আত্ম-সংরক্ষণ)।

বুর্জোয়া অর্থনীতির জনকরা (অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো ইত্যাদি) তাঁদের শাস্ত্রচর্চা শুরু করতেন রবিনসন ক্রুশো-র মতো একা জাহাজডুবি লোককে কেন্দ্রে রেখে। মার্কস ঠাট্টা করেছিলেন একক সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষকে নিয়ে সেই ভাবনার।[৮] কির্নান-ও এ বাবদে মার্কস-এর সঙ্গে একমত। আর সেই প্রসঙ্গেই বুদ্ধের অন্-আত্মবাদ তাঁর কাছে এত তাৎপর্যময়। এখানে প্রশ্নটা আর ব্যক্তিস্বরূপ-ও-ব্যক্তিগত সম্পত্তির নয়। আরও মূলে গিয়ে, ব্যষ্টি-সমষ্টির অভেদই হয়ে উঠেছে বুদ্ধ-ও-মার্কস-এর ধারাবাহিকতার সাধারণ সূত্র।

ক্ষণিকবাদ ও বিভ্রম : ব্রেশ্‌ট-এর উপদেশনা

দর্শন বা সমাজনীতি-অর্থনীতি নয়, আরও ব্যবহারিক ও

জরুরি সমস্যার উত্তরে বুদ্ধের একটি শিক্ষামূলক কাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিলেন আর-একজন বরেণ্য মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। নাম শুনে আশ্চর্য হবেন না: বের্টল্ট ব্রেশট (১৮৯৮-১৯৫৬)। তাঁর ''জ্বলন্ত বাড়ি বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশনা'' (১৯৩৭) কবিতাটি[৯] অনেকেই পড়েছেন। তবু সংক্ষেপে তার বিষয়বস্তুটি বলা যাক।

> বুদ্ধের শিষ্যরা একদিন জানতে চাইলেন: আপনি তো আমাদের প্রত্যেককে বাসনা ত্যাগ করতে বলেন, কিন্তু শূন্যতা, নির্বাণ জিনিসটা কি? এ শূন্যতা কি সুখের, নাকি নেহাতই শূন্য, ঠাণ্ডা, অ-বোধ ও ফাঁকা? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বুদ্ধ শুনলেন, 'তোমাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।' পরে অন্য শিষ্যদের কাছে তিনি একটি উপদেশনা (গ্রাইশনিস, প্যারাবল্) দিলেন। বুদ্ধ বললেন :
>
> —সে-দিন দেখলুম একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। বাড়ির ভেতরে যারা ছিল তাদের বললুম: একখুনি বেরিয়ে এস। —কিন্তু লোকগুলোর কোনো তাড়া নেই। তাদের একজন, আগুনে তার চুরুট পুড়ে গেছে, আমার কাছে জানতে চাইল: বাইরের অবস্থা কেমন, বিষ্টি হচ্ছে কিনা, বাতাস বইছে, না বইছে না, তাদের জন্যে অন্য বাড়ি মজুত আছে কিনা, এইসব। কোনো জবাব না দিয়ে আমি চলে এলুম। ভাবলুম, প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই লোকগুলো পুড়ে মরবে। ও-ঘরে থাকার চেয়ে যে কোন ঘরে যেতে যে-লোক তৈরি নয়, তাকে আমার কিছুই বলার নেই,

ব্রেশট এর সঙ্গে যোগ করেছেন: আমরা যারা সহ্য করার চেয়ে না-সহ্য করার শিল্প নিয়ে ভাবি, পার্থিব ধরনের নানা প্রস্তাব দিই, মানুষকে বলি তাদের মানুষ-অত্যাচারীদের ঝেড়ে ফেলতে, আমরাও বিশ্বাস করি, পুঁজি-র ক্রমবর্ধমান বোমারু বিমানবাহিনীর মুখে পড়েও যারা এতদিন ধরে প্রশ্ন করে চলেছে: আমরা কী করে এটা করব, ওটার ব্যাপারে কী ভাবছি, আর বিপ্লবের পরে তাদের জমানো টাকাকড়ি আর রোববারের পাতলুনগুলোর কী হবে—তাদেরও আমাদের বেশি কিছু বলার নেই।

এই মুহূর্তের বিপদই হল আসল কথা, তার থেকে বেরনোটাই প্রথম কাজ—এই সহজ সত্যটি ব্রেশট যেন ডুবুরির মতো তুলে এনেছিলেন বুদ্ধের উপদেশনা থেকে। নির্বাণের স্বরূপ পুরোপুরি জেনে তবে সব বাসনা ছেড়ে নির্বাণের সাধনা করব—এ যেমন হয় না, তেমনি বিপ্লবের পরে কী হবে—সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব পরিস্থিতির উত্তর পেলে তবে সে পথে আসব—এও হয় না। সমান-বাস্তবতার ক্ষেত্রে ক্ষণিকবাদ প্রয়োগের এটি এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন উঠতেই পারে : অন্য একটি কবিতায় ব্রেশট যেভাবে লাও-ৎসে-কে ব্যবহার করেছেন নিজের কথাই বলার জন্যে,[১০] এখানেও তাই ঘটে নি তো? 'বুদ্ধ যেমন বলেছিলেন নির্বাচনের প্রসঙ্গে, আমরাও তেমন বলি বিপ্লবের ক্ষেত্রে'—অন্তহীন প্রশ্ন-মুখর কিন্তু নির্বোধ লোকেদের মুখ বন্ধ করার জন্যেই কি বুদ্ধের উপদেশনাকে টেনে আনা? নাকি, দু-এর মধ্যে আরও গূঢ় কোনো যোগ আছে? ভাল্‌টের ভাইডেলি-র মতে, মিল রয়েছে আরও গভীরে। তিনি বলেছেন :[১১]

> দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বেরিয়ে আসছে বৌদ্ধ শূন্যবাদ (নিহিলিজম) থেকে—ব্রেশট যে এইভাবে তার বর্ণনা করেছেন, তা নিশ্ছয়ই আকস্মিক নয়। তাঁর মানসপ্রক্রিয়াগুলির অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতির সঙ্গেই বরং এটি মেলে। তাছাড়া, যা-আছে [-বর্তমান, বিদ্যমান] সেই নিরাশার কাছে এই দুটি চিন্তাধারাই [-বৌদ্ধ দর্শন ও মার্কসবাদ] নতি স্বীকার করে। কিন্তু বুদ্ধ যেখানে (তরুণ ব্রেশট এর মতো) বাসনার অভাব ও অবচেতনের নিদ্রার আশ্রয় নেন, মার্কসবাদ (ও তার ফলে তিরিশের দশকের ব্রেশট) এগিয়ে নিয়ে যায় এক বৈপ্লবিক না-সহ্য করার দিকে, এমন এক রূপান্তরের দিকে যার পরিণতি সম্পর্কে (এবং এই বিষয়টির ওপর জোর দিতে হবে) ব্রেশটও খুব স্পষ্ট নন। আসন্ন বিপদই এখানে বিচার্য, সে আগুন লাগার প্রশ্নই হোক বা ''পুঁজির ক্রমবর্ধমান বোমারু বিমানবাহিনী''র প্রশ্ন।[১২] অবশ্য একথা ঠিক, আখেরি জবাবের ব্যাপারে বুদ্ধ মুখ খোলেন না। তিনি শুনানি মুলতুবি রাখতে বলেন। তাঁর আমি-জানি-না-র সঙ্গে সোক্রাতেস-এর মিল আছে, আবার নেইও : তার মধ্যে ''কিন্তু-আমি-জানতে-চেষ্টা করব''-ও নিহিত থাকে।

শূন্যতানির্বাণ — এমন ধারণা একটু বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। আসল কথাটা হল 'পুদ্গলশূন্যতা,[১৩] ব্যক্তিস্বরূপ বলে কিছু-না থাকা, সুতরাং ব্যক্তিমানুষের বাসনার (পারিভাষিক নাম 'তন্‌হা', তৃষ্ণা) ক্ষয় ও লোপ। কবিতাটিতে তার কথাও এসেছে, কিন্তু সেটি এর মূল বিষয় নয়। ভাইডেলি নিপুণভাবে ধরেছেন অন্য একটি দিক। এ একেবারেই ব্যবহারিক প্রশ্ন। পুঁজির আক্রমণ থেকে বাঁচাটাই আসল কাজ — তার জন্যে চাই বিপ্লব — এ-ই হল গোড়ার কথা। আগে তো পুঁজিবাদের হাত থেকে বাঁচি, তবে তো আসবে অন্য হাজার-এক প্রশ্ন। উদ্ধার হওয়ার পরে অবস্থা কী দাঁড়াবে সে-বিষয়ে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না, যাবে না। নির্বাণ খুব সুখের — অবস্থা এমন লোভ দেখিয়ে কাউকে দলে টানার দরকার নেই। ভবিষ্যৎ এখনও আবছা, কিন্তু বর্তমান যে জানে মারছে — এই বোধই যদি কারও না থাকে, তবে তার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া অর্থহীন।

স্পষ্ট কথার উপকারিতা

মিলের এলাকাটা আরও বাড়ানো যায়। ভাইডেলি-সূত্রেই বলা চলে : 'আমি-জানি-না ' বলার সদ্ অভ্যাসটা বড়ো ব্যাপার। পালিতে একেই বলে 'অব্যাকত' ,যা বলা হয় নি।[১৪] যা জানা নেই তার ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় 'জানি না' বলে দেওয়াই উচিত। অমন সাফ 'না' শুনলে অনুগামী ও হবু-সমর্থকদের আস্থা চোট খেতে পারে, কিন্তু এর ভেতর দিয়েই যুক্তিশীল মানুষ তাঁর জীবনের একটা আচরণবিধি গড়ে নিতে পারেন। পস্টাপস্টি বলে দেওয়াই ভালো : জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বেরলেই ঠিক আগের মতো বাড়ি না-ও জুটতে পারে — বিপ্লব হলেই তার পরমুহূর্তে স্বর্গসুখ জুটবে না। কিন্তু পুঁজিবাদের আওতায় বাঁচা মানে জতুগৃহে বাস — এই জ্বালাবোধ যদি থাকে, তবে তার থেকে নিস্তার পাওয়াটাই প্রথম কাজ। আর নিস্তার পাওয়া মানে বিপ্লব, পুঁজিবাদকে সমূলে উপড়নো। কোনো লুকোছাপা না-করে আগেভাগে বলে রাখাই ভালো বিপ্লবের পরে কী ঘটবে তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু অলাতচক্র থেকে বেরনোর এই একটাই পথ আছে। আপাতত বিপ্লবেই নির্বাণ।

এইভাবেই দর্শন ও নীতিবিদ্যা, সমাজ দর্শন ও ব্যবহারিক জীবন — সবই হয়ে ওঠে একই শিকলির আলাদা আলাদা আংটা।

বুদ্ধের সমাজ চিন্তা: রাহুলের চোখে

আবার রাহুলের প্রসঙ্গেই ফেরা যাক। কিননি বা ব্রেশট যে-জায়গায় বুদ্ধ-মার্কস-এর মিলনরেখা দেখেছেন, রাহুল কিন্তু সেখানে তা দেখেন নি বা তার চেষ্টাও করেন নি। দ্বান্দ্বিকতার ধারায় পূর্বসূরি — একমাত্র এই হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেছেন বুদ্ধকে। বাকি আর সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি একেবারেই অবৌদ্ধ। নবদীক্ষিত কমিউনিস্টের আগুনখেকো ভাব নিয়ে, চল্লিশের দশকের গোড়ার তিনি রায় দিয়েছিলেন:[১৫]

> শ্রেণীদৃষ্টিতে দেখলে বৌদ্ধ ধর্ম [= তার সমাজদর্শন] ছিল শাসক শ্রেণীর এজেন্টদের [এই ইংরিজি শব্দটিই ব্যবহার করেছেন তিনি] মধ্যস্থ-র মতো, শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থকে না সরিয়ে তা নিজেকে দেখাতে চেয়েছিল ন্যায়ের পক্ষপাতী হিসেবে।

খুবই কড়া কথা। বুদ্ধের সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি নিয়ে রাহুল তখন (১৯৪২) যা লিখেছিলেন তার থেকে বোঝা যায়: দর্শনের বাইরে, বুদ্ধের আর কোনো দিক সম্বন্ধে (ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ছাড়া) তাঁর তেমন উঁচু ধারণা ছিল না। এ বাবদে বুদ্ধের যে-সীমাবদ্ধতা সে-বিষয়ে তিনি শুধু সচেতনই নন,কঠোর সমালোচকও। এক কথায় বললে, দর্শনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন, ক্ষণিকবাদ,অন্-আত্মবাদ) ও জীবনচর্যায় প্রায় পুরোপুরিই তিনি বুদ্ধের শিষ্য ; কিন্তু সমাজনীতি-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, মার্কস-এর।

বোধ হয় এই অর্থেই রাহুল নিজেকে একই সঙ্গে বুদ্ধ ও মার্কস-এর শিষ্য ভাবতেন।

অন্য বিকল্প

বা অন্য একটি দিক থেকেও ব্যাপারটা ঘটে থাকতে পারে। বাস্তির অথাৎ ব্যক্তি মানুষের অন্তর্জীবনের সমস্যা নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বিশেষ কিছু লেখেন নি (অন্যদের স্মৃতিকথায় বা নিজেদের মধ্যেকার চিঠিপত্রে ছাড়াছাড়া কয়েকটি মন্তব্যই এ বাবদে একমাত্র সম্বল)।[১৬] এ ব্যাপারে বুদ্ধই রাহুলের সহায়। আবার সমষ্টির,অথাৎ সমাজজীবনের সমস্যা ও রূপান্তরের বিষয়ে বুদ্ধ যেখানে নীরব (পুঁজিবাদের কথাই তিনি জানতেন না, মায় সামন্ততন্ত্রের চেহারাই দেখেন নি; সমাজবাদের কোনো প্রেক্ষিতেই তাঁর কাছে ছিল না),সেখানে তাঁর আশ্রয়—মার্কস। বুদ্ধ থেকে তিনি পেয়েছিলেন আ ত্ম শ র ণে র শি ক্ষা (বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্ন বুদ্ধের অনুগামীদের তৈরি, বুদ্ধ বলেছিলেন আত্মশরণ-ধর্মশরণ-অন্-অন্য শরণের কথা[১৭]),আর সেই শিক্ষাই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল মার্কসবাদের। বুদ্ধের কালবাদ থেকেই তিনি শিখেছিলেন: মার্কসবাদই একালের

সত্যিকারের 'ধম্ম'।

বুদ্ধের সমাজ চিন্তা: অন্য মত।

বুদ্ধ ও মার্কস হয়তো এই ভাবেই রাহুলের জীবনের দুটি দিক ধরে ছিলেন, পূরণ করেছিলেন দু ধরনের আকুলতা। এ ব্যাখ্যা পুরো ঠিক না-ও হতে পারে। অন্য কোনো দিকও থাকা সম্ভব।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠবেই: বুদ্ধের সমাজ-ও রাষ্ট্র-ভাবনা সম্পর্কে রাহুলের যে প্রায় আগাগোড়াই নস্যাৎ করার মনোভাব—সেটি কি মেনে নেওয়া যায়? এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে (উপায়ের ব্যাপারে নয়) বুদ্ধ ও মার্কস যে একই স্রোতে পড়েন—তারও তো সন্ধান মিলেছে। বৌদ্ধ চিন্তাধারার বহু দিকের সঙ্গে একমত না-হয়েও, রাহুলের সমকালীন ও কনিষ্ঠ মার্কসবাদীরা বুদ্ধবচনের মধ্যেই (মূলত হীনযান অথাৎ পালি সূত্রে) দেখতে পেয়েছেন অসাধারণ মৌলিকতা ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা। ইওরোপের মার্কসবাদীরা তার খবর রাখতেন না।[১৮] অথচ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে বুদ্ধকে 'প্রথম সমাজবিজ্ঞানী' বলেছেন[১৯]—সে তো অকারণে নয়। 'দ্বিতীয় নগরায়ন'(সিন্ধু সভ্যতা ছিল প্রথম) বা গাঙ্গেয় উপত্যকার সভ্যতায় যখন জনগোষ্ঠীর গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের পত্তন হচ্ছে, সেই ক্রান্তিবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ (বা তাঁরই কোনো আদি শিষ্য) সচেতনভাবে গড়ে তুলেছিলেন পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক সুসংহত তত্ত্ব। সামাজিক চুক্তি মতবাদের (রুশো-কেই যার জনক বলে ধরা হয়, যদিও তাঁর আগেও কেউ কেউ তেমন আভাস দিয়েছিলেন) পূর্ণ ব্যাখান পাওয়া যায় "অগ্গঞ্ঞ সুত্ত" ('দীঘ নিকায়'২৭)-য়।[২০] সে-ব্যাখান একই সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ও নৈতিক। জমির ওপর জনগোষ্ঠীর সামূহিক অধিকার ভেঙে গেল নিরাপত্তা আর লোভের তাড়নায়,দেখা দিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাকে বাঁচাতেই দরকার পড়ল রাজা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার (কোনো দৈব অধিকারবলে নয়)—এসব কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা আছে সেখানে। বুদ্ধ কোনো শিরোমণিসর্বস্ব রাজ্যকল্পনা বা নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা করেন নি যেমন করেছিলেন প্লেটো (আনু.খ্রিপূ ৪২৯-৩৪৭) ও আরিস্টোটল (খ্রিপূ ৩৮৪-৩২২)। ক্ষীয়মান 'গণ' আর উদীয়মান রাজতন্ত্রের মধ্যে তাঁর **পছন্দ ছিল** প্রথমটিই। সঙ্ঘের নিয়মও তাই তৈরি হয়েছিল 'গণ'-এরই আদলে।[২১] সেখানে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, থাকবে না পাকা আইনের নিগড়। কিন্তু শৃঙ্খলা হবে কঠোর,বেচাল কিছু করলেই শাস্তি পেতে হবে।[২২] বুদ্ধ তার নিয়ামক কিন্তু একমাত্র হর্তা-কর্তা-বিধাতা নন। এই সঙ্ঘই ছিল বুদ্ধের আদর্শ সমাজের অনুক্রম। সব ভিক্ষুই আত্মদীপ (-স্বপ্রতিষ্ঠ) আত্মশরণ অননন্যশরণ, ধর্মদ্বীপ ধর্মশরণ অননন্যশরণ হোন—**এই ছিল** তাঁর শেষ ইচ্ছে।[২৩] বুদ্ধ তাই লক্ষ লক্ষ ধর্মগুরুর একজন নন, তিনি এক অভূতপূব সদ্ধর্মের প্রচারক—যেখানে নিত্য বলে কিছু নেই, আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই। প্রতিটি মানুষের স্বাধীন আত্মবিকাশ ও স্ফুরণ যেখানে সঙ্ঘের তথা সমাজের উন্নতির প্রথম শর্ত। ২৫০০ বছর আগে চিন্তার এই স্বচ্ছতা আজও আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগায়।

রাহুলের বিরূপতা : কেন ?

রাহুল এর কিছুই জানতেন না এমন তো নয়! তিনি নিজেই এসবের সম্পাদনা ও/বা অনুবাদ করেছিলেন (অনুবাদকর্ম অনেক বেশি মন দিয়ে পড়তে হয়)। রাজাদের অনন্ত ধনতৃষ্ণা, পররাজ্য আক্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে 'গণ'-এর সমতন্ত্রের কথা তিনি উল্লেখও করেছেন।[২৪] কিন্তু তাঁর চোখে বড়ো অপরাধ হয়ে দেখা দিয়েছিল অন্য একটি বিষয়। পালি বিনয়পিটক-এ লেখা আছে: ঋণী, দাস, রাজসৈনিক ইত্যাদিকে প্রব্রজ্যা দিতে বারণ করেছিলেন বুদ্ধ। তার থেকেই রাহুলের সিদ্ধান্ত[২৫]:

> এই ভাবে দুঃখসত্যকে দেখে সংসারে দুঃখহেতুগুলোকে দূর করার যে প্রশ্ন ছিল, সে তো শেষ হয়ে গেল; এখন শুধু তার আধ্যাত্মিক মূল্য রয়ে গেছে,আর তা-ই হওয়ার দরুন সম্পত্তিওয়ালা শ্রেণীর কাছে বুদ্ধের দর্শন হয়ে যাচ্ছে বিষদন্তহীন সাপের মতন।

রাহুলের মতো বিচারশীল মানুষের বোঝা উচিত ছিল,"মহাবগ্গ"র ঐ অংশটি (১৩।৪) প্রক্ষিপ্ত হওয়াটাই সম্ভব। বুদ্ধের গোটা পরিমার্গ বা অ্যাপ্রোচ-এর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। অন্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের (মহাসাঙ্ঘিক, মহীশাসক ও সর্বাস্তিবাদী) বিনয়-এ রাজসৈনিক বা দাসদের প্রব্রজ্যার বিষয়ে হ্যাঁ-না কিছুই বলা হয় নি। পালি বিনয়-ই যে সবাদি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের গুলো পরের—এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। খ্রিপূ ২৫০ নাগাদ বিদিশা অঞ্চলে যে-বিনয় চালু ছিল, এখনও অবধি পাওয়া ছ-টি বিনয়-ই তার রকমফের মাত্র। বুদ্ধের মৃত্যুর অন্তত একশ বছর পরে সঙ্কলন করা হয়েছিল বিনয় পিটক—আধুনিক বিদ্বানরা এমনই মনে করেন (প্রথম সঙ্গীতি-র কাহিনীটি ততটা নির্ভরযোগ্য নয়)। আর "মহাবগ্গ" অংশটি আরও পরের, বিনয়পিটক-এর প্রাচীনতম অংশের মধ্যে তা পড়ে না। স্থানীয় শাসকদের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী এই সব অনুমতি-নিষেধের গল্প তৈরি করা **হয়েছিল বুদ্ধের** নামে—এমন মনে করাই সঙ্গত।[২৬]

বৌদ্ধ রাষ্ট্রদর্শন :কোসম্বীর চোখে

আরও একটা কথা বলা দরকার। প্রাচীন সমাজ ও 'গণ'-র ইতিবাচক দিকগুলির বিশ্লেষণেই বুদ্ধের (বা তাঁর আদি শিষ্যদের) কৃতিত্বের তালিকা ফুরিয়ে যায় না। সমকালীন সমাজের দুর্দশা কাটানোর জন্য, একচ্ছত্র রাজাদের নতুন কর্তব্য সম্বন্ধেও কিছু 'বুদ্ধবচন' পাওয়া যায়। দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী-র মতো নাকউঁচু ঐতিহাসিককেও তা মোহিত করেছে (কোসম্বীকে আর যে-নিন্দেই করা যাক,'উগ্র জাতীয়তাবাদী' বলা যায় না কিছুতেই)। তিনি লিখেছেন[২৭]:

> রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (বিষয়ে) এ এক চমকে-দেওয়ার-মতো আধুনিক অভিমত। বৈদিক যজ্ঞের সময়ে, যে-সমাজ সবে আদিম অরণ্য জয় করতে শুরু করেছে, তার কাছে এই অভিমত প্রচার করা ছিল স ব চে য়ে উঁ চু প র্যা য়ে র ম ন ন গ ত (ই ন্ টে লে ক চু অ ল) কৃতিত্ব। এই নতুন দর্শন মানুষকে দিয়েছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। যা দিতে পারেনি তা হল প্রকৃতির ওপর সীমাহীন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ, যার সুফল গোটা মানবজাতি তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ করে নেবে।

এই ভাবে কোসম্বী-র বিচারেও—অন্তত এই একটি ব্যাপারে—বুদ্ধের ও মার্কস-এর চিন্তা খুব কাছাকাছি চলে আসে। উৎস থেকে উজানের পথে একই নদীর দুই ঘাট হিসেবে তাদের ধরতে কোনো অসুবিধেই হয় না।

কী ছিল এই নতুন রাষ্ট্রদর্শন? কোসম্বীর ভাষাতেই তার সারকথা উপস্থিত করা যাক[২৮]:

> দস্যু ও সমাজবিরোধী লোকজনের হাতে উৎপীড়িত দেশ থেকে যে-রাজা শুধুই কর-সংগ্রহ করেন,তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না। দস্যু বৃত্তি ও সন্ত্রাস কখনও বলপ্রয়োগ করে ও নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে দমন করা যায় না। সামাজিক অসঙ্গলের মূল হল দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাব। দানধ্যান আর অর্থসাহায্যের উৎকোচ দিয়ে তা দূর করা যায় না; তাতে শুধু অমঙ্গলজনক কার্যগুলিকেই পুরস্কৃত করা ও আরও উদ্রিক্ত করা হবে। সঠিক উপায় হল কৃষি-ও পশুপালন-জীবী মানুষদের বীজ ও খাদ্য সরবরাহ করা। বাণিজ্যজীবীদের প্রয়োজনীয় মূলধন জোগান দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের সেবকদের ঠিকমতো ও নিয়মমতো বেতন দেওয়া উচিত যাতে তারা আর জনপদগুলিকে নিংড়ে নেওয়ার উপায় না পায়। এই ভাবে জন্ম নেবে নতুন সম্পদ,জনপদগুলি দস্যু-ও প্রতারক-মুক্ত হবে। সেই ধরনের উৎপাদনশীল ও পরিতৃষ্ট পরিবেশে নাগরিক তাঁর সন্তানদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ করতে পারবেন অভাব ও ভয় থেকে। সঞ্চয়নের উদ্‌যত্ত — রাজকোষেরই হোক বা স্বেচ্ছায় দেওয়া ব্যক্তিগত দান থেকেই হোক—খরচ করার সেরা উপায় পূর্তকর্ম, যেমন কুয়ো ও পুকুর খোঁড়া আর বাণিজ্য পথের ধারে ধারে সারি দিয়ে গাছ পোতা।

["কূটদন্ত সুত্ত"('দীঘ নিকায়' ৫) ও "চক্কবত্তি-সীহনাদ সুত্ত" (ঐ, ২৬)-য় এই কথাগুলি পাওয়া যায়। পরিশিষ্ট ৫ দ্র.]

বুদ্ধ ও অশোক : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বুদ্ধবচনের এই সব দিক কেন রাহুলের কাছে কোনো গুরুত্বই পায় নি? কোসম্বীর বিবরণ থেকেই আমরা তো জানি, কথাগুলো শুধু ঈঙ্গিত চিন্তা বা হলে-বেশ-হত বা এমনটিই-হওয়া-উচিত-এ শেষ হয়ে যায় নি। এর দু শতকের মধ্যেই এই সব প্রকল্পকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন সম্রাট অশোক। তুলনা দিয়ে বলা যায়, মার্কস-এর তত্ত্বের সঙ্গে লেনিন-এর প্রয়োগের যে-সম্পর্ক, বুদ্ধের সঙ্গে অশোকের সম্পর্কও অনেকটা তা-ই। 'যা কিছু আমি চেষ্টা করেছি তা (সর্ব) ভূতের কাছে আমার ঋণ শোধের প্রয়াস'—অশোকের এই উক্তি (শিলালিপি ৬, গিরনার) সম্পর্কে কোসম্বী বলেছেন[২৯]:

> এও ছিল রাজত্বের এক নতুন আদর্শ, যা চমকে দেয় ও অনুপ্রাণিত করে। আগের মগধ রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোনো মিলই ছিল না সেখানে রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতীক। 'অর্থশাস্ত্র'র রাজা কারও কোনো ধার ধারতেন না। তাঁর একমাত্র কর্তব্যকর্ম ছিল

রাষ্ট্রের লাভের জন্যে শাসন করা। তার চূড়ান্ত মাপকাঠি ছিল একটাই : দক্ষতা। ষষ্ঠ শতকের মগধের ধর্মগুলিতে যে-সমাজদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল, অবশেষে অশোকের ক্ষেত্রে তা [রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও কর্মের] ভেতরে ঢুকল।

আদর্শ ন্যায়নীতি — বুদ্ধ ও অশোক যার জন্য ব্যবহার করেছেন 'ধম্ম' শব্দটি (যার মনে সদ্ আচার, ভালো ব্যবহার)[৩০] — তার প্রয়োগের জমিই তৈরি হয় নি খ্রিপূ পঞ্চম বা তৃতীয় শতকের ভারতে। যথাসময়ের বহু আগে গড়ে-ওঠা এই রাষ্ট্রনীতি তাই কোনো শ্রেণীহীন সমাজ তৈরির কাজে লাগে নি, উলটে হয়ে উঠেছিল—রাহুল যেমন বলেছেন—শ্রেণীসমন্বয়ের দর্শন। কিন্তু কোসম্বীর যাকে মনে হয়েছে 'সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের মননগত কৃতিত্ব', তার মূল্য কি তাতে কমে যায়? প্রাক্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা কি প্রমাণ করে : বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সমাজ কখনোই গড়া যায় না? নাকি, আরও একবার ঠেকে শিখতে হবে : কাজটা সহজ নয়, বহু শত বছর ধরে সাফল্য-ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই সে-চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়? অশোকও তাঁর সময়ে সে-আদর্শকে স্থায়ী কোনো রূপ দিতে পারেন নি, লেনিনও পারলেন না—কিন্তু ইচ্ছার মূল তো উপড়নো যায় নি। পরাজয়ে অপরাজেয় এই তত্ত্ব (ও প্রয়োগের প্রয়াস) বুদ্ধ-অশোক থেকে মার্কস-লেনিন পেরিয়ে আজও তো অব্যাহত আছে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক ইতিহাসেও তো দেখা গেছে, বুদ্ধের সমাজচিন্তায় জাতিভেদ-বিরোধিতা আজও কত জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক। 'হিন্দু ব্রাহ্মণশাহী'র অত্যাচার এড়াতে, আর কোথাও ঠাঁই না-পেয়ে, বাবাসাহেব অম্বেডকর তাই পাঁচ লাখ অনুগামী সমেত শরণ নেন বুদ্ধের (১৪ অক্টোবর ১৯৫৬)। বুদ্ধের জন্মের আড়াই হাজার বছর বাদে এই ভাবেই ভারতে পুনরুত্থান হল বৌদ্ধধর্মের। এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন রাহুল নিজেও।[৩২]

'দর্শন' জিনিসটায় কোসম্বী খুব একটা স্বস্তি বোধ করতেন না। তাঁর বিশ্লেষণকে তিনি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন বুদ্ধের সমাজ দর্শনেই। তাঁকে মুগ্ধ করার পক্ষে তা-ই ছিল যথেষ্ট (বারেবারে তাই তিনি 'চমকে দেওয়ার মতো', স্টার্টলিং, বিশেষণটি ব্যবহার করেন)। এর সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতার ইতিহাসে বৌদ্ধ অবদানকে যোগ করলে (যেমন করেছেন রাহুল)—বৌদ্ধ বীক্ষার ব্যাপ্তি ও গভীরতা আরও ভাস্বর হয়ে উঠবে।

উপসংহার : রাহুলের কৃতিত্ব

বুদ্ধের সমাজচিন্তার ব্যাপারে কোসম্বী বা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তুলনায় রাহুল কিছুটা ক্ষীণদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় তিনি যে অমোঘ মননদৃষ্টির প্রমাণ রেখেছেন তার গুরুত্ব যদি আমরা না বুঝি, তার চেয়ে খেদের আর কিছুই থাকতে পারে না। ইওরোপ-কেন্দ্রিকতা ('-সর্বস্বতা' বললেই ঠিক হয়) কাটিয়ে আমরা যেদিন দর্শন তথা আইডিআ-র ইতিহাস পড়তে শিখব পূর্ব-পশ্চিমকে সমন্বিত করে (যার পথ দেখিয়েছেন চীন-বিশেষজ্ঞ জোসেফ নীডহ্যাম), সেদিন আমরা বুঝব : কত বড়ো একটা কাজ করেছিলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন—বুদ্ধ আর মার্কসকে এক ধারায় একত্র করে। বুঝব : ব্যষ্টির জীবনযাত্রা, নীতিবোধ ও কর্তব্য (বুদ্ধ) আর সমষ্টির সমাজজীবন, রীতি ও দায়িত্ব (মার্কস)—দু-এর মধ্যে সঙ্গতির প্রয়োজন কত বেশি। ইতিহাসই শেখাচ্ছে : ভোগ আর ত্যাগের মাঝপথ (মজ্ঝিমা পটিপদা) দিয়ে চলার অভ্যেস রপ্ত করা চাই, নইলে অনির্দিষ্টকাল ধরে কৃচ্ছ্রসাধন আর সীমাহীন ভোগবাদ—এই 'বাম' ও 'দক্ষিণ' বিচ্যুতি কুরে কুরে খেয়ে দেবে কমিউনিজমের শেকড়কে। সে-অভিজ্ঞতাও তো আমাদের হল।[৩৩] তেমনি আরও একটা ব্যাপারেও হয়তো আমরাই পশ্চিমের হেগেল-বিশারদদের বোঝাতে পারব : পূর্বদৃষ্টান্তের সন্ধানে হেগেল কেন শুধু হেরাক্লিতাস-এর দিকেই হাত বাড়ান নি, যথেষ্ট না-জানা সত্ত্বেও নাগাল পেতে চেয়েছিলেন বুদ্ধেরও।[৩৪]

টীকা

১. রাহুল সাংকৃত্যায়নের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুলিখিত ও নির্ভরযোগ্য জীবনকথা (যদিও ছোটোদের জন্যে লেখা) আছে তাঁর বহু দিনের সুখ-দুঃখের সাথী ভদন্ত আনন্দ কৌসল্যায়নের ('রাহুল সাংকৃত্যায়ন' (হিন্দী), নয়া দিল্লী: পীপুলস পাব্লিশিংগ হাউস, ১৯৭৯)। প্রভাকর মাচবে-র বইটি ('রাহুল সাংকৃত্যায়ন', নয়া দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৯) অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক। সেই বই পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ ভাবেন ও লেখেন, রাহুলের জীবনে কমিউনিস্ট হওয়াটা এক স্বল্পস্থায়ী পর্ব বা ইন্টারল্যুড মাত্র ('আনন্দবাজার পত্রিকা,' ২৪ এপ্রিল ১৯৯২-এ রবিবারের ক্রোড়পত্রে শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দ্র.)। একেবারেই ঠিক নয় কথাটা। 'অন্তঃসার' ২ (দক্ষিণ গড়িয়া), ১৯৯২- এ বিষয়টি নিয়ে আরও তথ্যপ্রমাণ সহ আলোচনা পাওয়া যাবে।

২. 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ' (হিন্দী), কলকাতা/এলাহাবাদ: আধুনিক পুস্তক ভবন/লোকভারতী প্রকাশন, ১৯৭৪ (মূল রচনা: ১৯৪২), পৃ. ৪৪। গান্ধীর মতামতের তুলনায় বৌদ্ধমত কেন প্রগতিশীল—সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধের কথা এসেছিল।—কালবাদের কথা আছে ''পাসাদিক সুত্ত'' ('দীঘ নিকায়'২৬)-য়।

৩. টি ডবলিউ রিস ডেভিডস, 'ডায়ালগস্ অফ দ বুদ্ধ', লন্ডন: পালি টেক্স্ট সোসাইটি,ভাগ ২, ১৯১০,পৃ. ২৪২ দ্র.।

৪. থ. চেরবাট্স্কি, ''ফিলজফিকাল ডক্‌ট্রিন অফ বুদ্ধিজম'', 'ফারদার পেপার্স্ অফ চেরবাট্স্কি', কলকাতা: ইন্‌ডিআন স্টাডিজ: পাস্ট অ্যান্‌ড প্রেজেন্ট, ১৯৭১, পৃ. ২৬।

৫. থ. চেরবাট্স্কি, 'বুদ্ধিস্ট লজিক', খণ্ড ১, নিউ ইয়র্ক:ডোভার পাবলিকেশনস, ১৯৬২ (প্রথম প্রকাশ : লেনিনগ্রাদ, আনু. ১৯৩০), পৃ. ৪২৯ টী ১ দ্র.। হেরাক্লিতাস-এর মধ্যে যাঁরা আস্ত হেগেল বা আস্ত মার্কসকে দেখতে পান, তাঁদের বিরুদ্ধে সেখানে তিনি প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস-কে লেখা মার্কস-এর একটি চিঠিরও (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮) উল্লেখ আছে (মার্কস এঙ্গেলস, 'কলেক্‌টেড ওয়র্কস', খণ্ড ৪০, মস্কো : প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৯ ইঃ দ্র.)।

৬. এ বিষয়ে চিন্মোহন সেহানবীশ, ''রাহুলজী প্রসঙ্গে,'' 'জলার্ক', রাহুল সাংকৃত্যায়ন সংখ্যা ১, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯২, পৃ. ৭৮ ও ভদন্ত আনন্দ কৌসল্যায়ন (সূত্র ১), পৃ. ৬৮ দ্র.।

৭. ভিক্টর কির্নান, ''সোশালিজম, দ প্রফেটিক মেমরি,'' 'পোএট্স্, পলিটিক্স্ অ্যান্‌ড দ পীপল্', লন্ডন: ভার্সো, ১৯৮৯, পৃ. ২০৪। প্রবন্ধটি ১৯৭৫-এ লেখা, ১৯৮৭-তে কির্নান কিছু সংযোজনও করেছিলেন।

৮. কার্ল মার্কস, 'আ কন্‌ট্রিবিউশন টু দ ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকনমি', মস্কো: প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৭০, পৃ. ১৮৮। এ প্রসঙ্গে ই এইচ কার-এর চমৎকার আলোচনা ('কাকে বলে ইতিহাস?', অধ্যায় ২) দ্র.।

৯. ''গ্লাইশনিস ডেস বুদ্ধ ফম ব্রেন্‌নেন্‌ডেন হাউস'', 'গেসাম্‌মেল্‌টে গেডিশ্‌টে', বান্‌ড্ ২, ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন: সুহ্‌রকাম্প ফেরলাগ, ১৯৬৭,পৃ. ৬৬৪-৬৬; ইংরিজি অনুবাদ: 'পোএম্‌স্', নয়া দিল্লী: রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ. ১৯০-৯২; বাঙলা অনুবাদ: ''বুদ্ধ যে- কাহিনী শোনালেন'', সমীর দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'বের্টোল্ট ব্রেখটের কবিতা', কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃ. ৫২-৫৪।

সিলভিসা শ্লেনস্টেট-এর মতে, এই উপদেশনাটি বৌদ্ধ সাহিত্যে নেই। মনে হয়, ব্রেশট এটি পেয়েছিলেন দিনেমার লেখক কার্ল গিয়েল্লেরুপ-এর 'তীর্থযাত্রী কামানিতা' উপন্যাস থেকে ('পোএমস', পৃ. ৫৬৬ দ্র.)। নাম দেখে মনে হয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে এমন কোনো কাহিনী (ত্রিপিটকের বাইরের) চালু ছিল। অথবা, এটি গিয়েল্লেরুপ-এরই রচনা। তবে, বুদ্ধের নামে অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে এর মিল খুবই প্রকট। ''চূলমালুংক্য সুত্ত'' ('মজ্ঝিম নিকায়', ২।২।৩)-য় 'অব্যাকত' প্রসঙ্গে বুদ্ধ ঠিক এই ধরনেরই একটি কাহিনী বলেছিলেন। (পরিশিষ্ট ১ দ্র.)

১০. ''লেগেন্‌ডে ফন ড্যের এন্‌স্টেহ্‌ং ডেস বুখেস তাওতেকিং আউফ ডেম ভেগ লাওৎসে ইন ডী এমিগ্রাংশিওন'', 'গেসাম্‌মেল্‌টে গেডিশ্‌টে', (সূত্র ৯), পৃ. ৬৬০-৬৩ ; ইংরিজি অনুবাদ : 'পোএমস' (সূত্র ৯), পৃ. ৩১৪-১৬। কোনো বাঙলা অনুবাদ চোখে পড়ে নি।

১১. ভাল্‌টের ভাইডেলি, 'দ আর্ট অফ বের্টোল্ট ব্রেশট', লন্ডন: দ মার্লিন প্রেস, তারিখ নেই, পৃ. ১০৪-০৫।

১২. মূল কবিতাটির অনুসরণে এই চরণটির অনুবাদ দেওয়া হল। ভাইডেলি-র ইংরিজি তর্জমাকার, ড্যানিএল রাসেল লিখেছেন ; 'দ গ্রোইং নাম্বারস অপ বোম্বারস ইন আ ক্যা পি টা লি স্ট স্কা ই' (সূত্র ১১, পৃ. ১০৫)।মূলে আছে:'...ডেস কাপিটালস্'। 'পুঁজিবাদী আকাশ' বললে শুধু অবান্তর শব্দ বাড়ে না, মানেটাও বদলে যায়।

১৩. থ. চেরবাট্স্কি, 'বুদ্ধিস্ট লজিক' (সূত্র ৫), খণ্ড ১-পৃ.- ৪-টীকা ১১-:- 'পুদ্‌গল নাস্তি-অনাত্মত্ব-নৈরাত্ম্য-পুদ্‌গলশূন্যতা'।

১৪. 'বৌদ্ধ দর্শন', এলাহাবাদ: কিতাব মহল, ১৯৭৭, পৃ. ৪৫। পরিশিষ্ট ১ দ্র.।

১৫. ঐ, পৃ. ৫৬।

১৬. মার্কসকে লেখা তরুণ এঙ্গেলস-এর একটি চিঠি (১৯ নভেমবর ১৮৪৪) এ ব্যাপারে অনেক ভাবনার খোরাক দেয়। ব্যক্তির একটি মাত্র 'অহমিকা' (এগোইজম)-কেই এঙ্গেলস সেখানে স্বীকার করেছেন। তা হল, নিজের কোনো ফললাভের আশায় আমরা কমিউনিস্ট হই নি, বুদ্ধির ও হৃদয়ের অহমিকাই মানবজাতির প্রতি আমাদের ভালোবাসার উৎস আর সেখান থেকেই আমাদের সব কাজের শুরু (মার্কস এঙ্গেলস : কলেক্টেড ওয়ার্কস. খণ্ড ৩৮, মস্কো: প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৮২,পৃ. ১২-১৩ দ্র.)। এই প্রায় না-পড়া/জানা চিঠিটি বোধ হয় প্রথম

সবার নজরে আনেন গেওর্গ লুকাচ ('দ মিনিং অফ কনটেম্পোরারি রিয়ালিজম', লন্ডন : দ মার্লিন প্রেস, পৃ. ১৩১-৩২)।

১৭. ''মহাপরিনিব্বান সুত্ত'' ('দীঘ নিকায়' ১৬) ও অন্যত্র (যেমন, ''চক্কবত্তি-সীহনাদ সুত্ত,'' ঐ, ২৬) এই ত্রিশরণের কথা আছে। পরিশিষ্ট ২ দ্র.।

১৮. যেমন গেওর্গি প্লেখানভ। রিস ডেভিডস-এর বিরুদ্ধে তাঁর পলেমিক-এর পেছনে খুব একট জ্ঞানবুদ্ধি কাজ করেছিল বলে মনে হয় না। অ্যানিমিজম বনাম নর্মালিজম-এর যুক্তিটাই তিনি ধরতে পারেন নি (''অন দ সো-কল্ড্ রিলিজিয়স সীকিংস ইন রাশিয়া'' (১৯০৯), দ্বিতীয় নিবন্ধ, 'সিলেক্ট্ ফিলোজফিকাল ওয়র্কস' খণ্ড ৩, মস্কো : প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৭৬, পৃ. ৩৪২-৪৫ দ্র.)। আসলে সমসাময়িক 'ভগবান্‌নির্মাতা'দের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁর প্রেক্ষিতটাই খানিক ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

১৯. 'দ বিগিনিংস', গ্লোবাল ফিলজফি ফর এভরিম্যান ১, বাঙ্গালোর : নবকর্নাটক পাবলিকেশনস, ১৯৯০, পৃ. ১০৯। পুরো আলোচনাটিই অবশ্যপাঠ্য।

২০. সাম্প্রতিক কিছু আলোচনার জন্যে দ্র. : রামশরণ শর্মা, 'অ্যাসপেক্ট্স্ অফ পলিটিকাল আইডিআজ অ্যান্ড ইন্‌স্টিট্যুশন্‌স্ ইন এনশেন্ট্ ইন্ডিআ', দিল্লী : মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৫৯, পৃ. ৭১, ৭৭ ; ভিক্খু তেলবট্টে রাহুল, 'আ ক্রিটিকাল স্টাডি অফ দ মহাবস্তু, দিল্লী : মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৭৮, পৃ. ৩০৬ ; উমা চক্রবর্তী, 'দ সোশাল ডাইমেনশন্‌স্ অফ আর্লি বুদ্ধিজম', দিল্লী : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃ. ১৫২ ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সূত্র ১৯), পৃ. ১২০-২৫।

২১. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন গোকুলদাস দে তাঁর 'ডিমক্রাসি ইন আর্লি বুদ্ধিস্ট সঙ্ঘ, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫-য়। তিনি দেখিয়েছেন, বিনয় পিটক-এ সঙ্ঘের যেসব নিয়ম লেখা আছে তার ভেতরকার গণতান্ত্রিক ধাঁচটি কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। শাক্য, কোলিয়, মল্ল ও বজ্জিদের 'গণে' যেসব প্রথা চালু ছিল, তার থেকেই বুদ্ধ তাঁর ভিক্খুসঙ্ঘের নিয়মনীতি নিয়েছিলেন। যদিও ''মহাবগ্গ''-র ঐ- অধ্যায়- চারটির নাম সঙ্ঘজীবনের সঙ্গেই যুক্ত (পব্বজা, উপসম্পদা, উপসথা, বস্‌সবাস ইঃ), আসলে কিন্তু তার অনেকখানিই 'গণ'-শাসনব্যবস্থা থেকে নেওয়া। এছাড়াও পরিশিষ্ট ৩, দ্র.।

২২. বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রথম যে-সঙ্গীতি (=সম্মিলন) বসে তাতে আগে ঠিক করা হয়েছিল সঙ্ঘের নিয়মনীতি সম্বন্ধে বুদ্ধ কী বলেছিলেন। ত্রিপিটক-এর প্রথম পিটক তাই বিনয় পিটক।—সঙ্গীতি বিষয়ে অবশ্য নানা পরম্পরা ও মতামত চালু আছে। সাম্প্রতিক গবেষণার সারসংক্ষেপের জন্যে রিচার্ড গোমব্রিচ, ''দ হিস্ট্রি অফ আর্লি বুদ্ধিজম : মেজর অ্যাডভান্সেস সিন্স্ ১৯৫০'' (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতায় ১৪-১৭ জানুয়ারি ১৯৮৬ ভারততত্ত্ব বিষয়ক চর্চা ও দক্ষিণ এশিয়ার রচনাপঞ্জি সংক্রান্ত সম্মিলনের সাইক্লোস্টাইল-করা কপি) দ্র.।

২৩. সূত্র ১৭ দ্র.।

২৪. 'বৌদ্ধ দর্শন' (সূত্র ১৪), পৃ. ২৭-২৮। এ ছাড়াও পরিশিষ্ট ৪ দ্র.।

২৫. ঐ, পৃ. ৫৮.

২৬. এরিখ ফ্রাউভালনার, 'দ আর্লিয়েস্ট বিনয় অ্যান্ড দ বিগিনিংস অফ বুদ্ধিস্ট লিটরেচর', রোম : ইস্তিতুতো ইতালিআনো পার ইল মেদিও এদ এস্ত্রেমো ওরিএন্তে, ১৯৫৬, পৃ,৩-৪, ২৩, ৭৫ ও গোমব্রিচ (সূত্র ২২) দ্র.।

২৭. কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ এনশেন্ট ইন্ডিআ ইন হিস্টরিকাল আউটলাইন', দিল্লী [ইঃ] : বিকাশ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২,পৃ. ১১৩-১৪ (এই লেখকেরই 'ইনট্রোডাকশন টু দ স্টাডি অফ ইন্ডিআন হিস্ট্রি, বোম্বাই : পপুলার প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃ. ১৭০-ও দ্র.)।—এখানে শুধু এইটুকুই যোগ করার আছে: 'প্রকৃতির ওপর সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ' জিনিসটা শেষ পর্যন্ত পুরো সুফল দেয় না। তার থেকেই এখন পরিবেশদূষণ তথা -নাশ নিয়ে এত দুর্ভোগ-দুর্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

২৮. ঐ, পৃ. ১১৩, পরিশিষ্ট ৫ দ্র.।

২৯. ঐ, পৃ. ১৫৯।

৩০. একটি অনুশাসনের গ্রিক অনুবাদে 'ধম্ম'র জায়গায় আছে Eusebeia, 'এ উ সে বে ই আ'—একেবারে যথাযথ শব্দ।আরামাইক ভাষায় উপযুক্ত প্রতিশব্দ না পাওয়ার দরুন যে শব্দটি লেখা হয়েছে (Qsyt), তার মানে 'সত্য', truth. 'এউসেবেইআ' মানে piety, filial respect, loyalty. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'স্টাডিজ ইন দ আরামাইক এডিক্ট্স অফ অশোক, কলকাতা : ইন্ডিআন মিউজিয়ম, ১৯৮৪, পৃ. ৩২-৩৩, ৫৮ দ্র.।

৩১. হেরাক্লিতাস-এর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি আর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ঠিক উলটো মেরুতে রাখা যায় বুদ্ধকে। এ বিষয়ে জর্জ টমসন, 'দ ফার্স্ট ফিলজফারস', লন্ডন : লরেন্‌স্ অ্যান্ড উইশার্ট, ১৯৭৭, পৃ. ২৩৭-৭৫ দ্র.। অন্যত্র ('জলার্ক', সূত্র ৬) ঐ বিষয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা করেছি।

৩২. অম্বেডকর ও তাঁর অনুগামীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর, ডিসেম্বর ১৯৫৬-য় সারনাথের 'ধর্মদূত' পত্রিকায় ''নবদীক্ষিত বৌদ্ধ'' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন রাহুল। অম্বেডকরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। রাহুলের প্রবন্ধটি পরে পুস্তিকা হিসেবেও বেরিয়েছে (লখনউ এর বুদ্ধ বিহার-প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণটি ১৯৮২ আমি দেখেছি)।

রাহুল আর অম্বেডকরের তফাতটাও অবশ্য ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। অম্বেডকরের কাছে বাছাই করার মতো ভাবাদর্শ ছিল দুটি : মার্কসবাদ আর বৌদ্ধধর্ম। প্রথমটিকে পুরোপুরি বর্জন করে তিনি স্বীকার করেছিলেন দ্বিতীয়টিকে। তার মূল কারণটা ততটা দর্শনঘটিত নয়, যতটা সমাজনীতি-ঘটিত। অন্যদিকে রাহুলের বিশ্ববীক্ষায় মার্কস ও বুদ্ধের গরমিলের মধ্যেও একটা মেলার জায়গা ছিল। ফলে একের জন্যে অন্যকে পুরোপুরি নাকচ করার মতো অবস্থায় তাঁকে পড়তে হয় নি।

৩৩. ই এফ শুমাকের-এর 'স্মল ইজ বিউটিফুল' (লন্ডন : অ্যাবাকাস, ১৯৭৪)-এর একটি অধ্যায় (''বুদ্ধিস্ট ইকনমিকস'') এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের পঞ্চমটি হল : সঠিক জীবিকা সম্মা আজীব, সংস্কৃত-য় 'সম্যক্ জীবিকা'। তারই সূত্র ধরে শুমাকের 'বৌদ্ধ অর্থনীতি'র একটা কাঠামো খাড়া করেছেন (পৃ. ৪৪-৫১ দ্র.)। 'লক্খন সুত্ত'' ('দীর্ঘ নিকায়' ৩০)-এ সম্যক্ জীবিকা সম্পর্কে আলোচনা আছে।

৩৪. চেরবাট্স্কি (সূত্র ৫), খণ্ড ১, পৃ. ৪২৫দ্র.। হেগেল-এর 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান' ও 'যুক্তিবিদ্যা'য় 'নাস্তিত্ব' প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই বৌদ্ধ দর্শনের প্রসঙ্গ এসেছে। কান্ট্-এর চিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের মিল নিয়েও আলোচনা হয়েছে (ঐ, পৃ. ৪৭৭-৭৮ দ্র.)।

আগেই বলেছি, দর্শন নিয়ে কোসম্বী বিশেষ কোনো মন্তব্য করতেন না, বিস্তৃত আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বৌদ্ধ চিন্তায় কার্যকারণ সম্পর্কের সূচনা (পারিভাষিক নাম : পটিচ্চ সমুপ্পাদ, সংস্কৃত-য় : প্রতীত্য সমুৎপাদ) সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : সব কার্যকারণ ভাবই নিরোধের (নিগেশন) সূচনা করে—এ-ই হল দ্বান্দ্বিকতার প্রথম পদক্ষেপ। উচ্চতর পর্যায়ে অগ্রগতি (''নিরোধের নিরোধ'' দিয়ে) আরও বড় ধরনের প্রগতি ছাড়া হয় না। খ্রিপূ ষষ্ঠ শতকের ভারতে তার সম্ভাবনা ছিল না ['ইনট্রোডাকশন' (সূত্র ২৭), পৃ. ১৭১]। তেমনি 'নির্বাণ' প্রসঙ্গেও কোসম্বী কিছু বিচক্ষণ মন্তব্য করেছেন (ঐ)। মুশকিল হচ্ছে, আমাদের দেশের দর্শনবিদ্‌রা বোধহয় ইতিহাস পড়েন না, আর দর্শনের বা রাষ্ট্রনীতির বা অর্থনীতির ইতিহাস নিয়ে লেখাপত্রে কেউ ত্রিপিটক-এর নাম করেন না, এমনকি কোসম্বী বা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথাও আনেন না (আনেন শুধু সিনেলেকচুঅল-রা!)। অথচ 'ভারতীয়করণ' বলে একটা গালভারী কথা আজকাল অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মুখেই শোনা যায়। এটাকেই বোধহয় দেশের সাম্প্রতিকতম দুর্লক্ষণ বলে ধরা উচিত।

পরিশিষ্ট

১. *অব্যাকত প্রসঙ্গে (সূত্র ৯ ও ১৪)*

বুদ্ধ বললেন : একটি লোকের গায়ে বিষাক্ত তীরের ফলা বিঁধেছে। তার ভাই-বন্ধুরা মিলে তখন শল্য-চিকিৎসককে নিয়ে এল। আহত লোকটি বলল : যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি এই বৈদ্যটি জাতে কী, তার নাম কী, গোত্র কী, লম্বা না বেঁটে না মাঝারি, কালো না ফরসা, না মাগুর মাছের মতো রঙ, গ্রামে থাকে না নগরে থাকে — ততক্ষণ আমি ঐ থলি বার করতে দেব না। এরকম আরও হাজার- এক প্রশ্নের উত্তর না পেলে সে চিকিৎসাই হতে দেবে না। বুদ্ধ বললেন : এত সব প্রশ্নের উত্তর জানার আগেই লোকটা কিন্তু মরে যাবে। তেমনি, হে মালুংকাপুত্ত, (নির্বাণের বিষয়ে) তুমি যে সব অব্যাকত (বৈদিক ভাষায় 'অব্যাকৃত', যা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি, নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া হয় নি) বিষয় জানতে চাইছ, তারও উত্তর পাবে না, তার আগেই মরে যাবে। আমার অব্যাকতগুলোকে অব্যাকত বলেই ধরে নাও, ব্যাকতগুলোকে ব্যাকত বলেই ধরো। আর ব্যাকত মানে চারটি (আর্য সত্য) : দুঃখ-দুঃখের হেতু-দুঃখের নিরোধ দুঃখ- নিরোধের পথ।—'মজ্ঝিম নিকায়' ৬৩ (সংক্ষিপ্ত)। এছাড়াও ''পাসাদিক সুত্ত'' ('দীঘ নিকায়' ২৯) দ্র.।

২. *আত্মশরণ (সূত্র ১৭)*

[বুদ্ধ বললেন :] সেই জন্যই বলি, আনন্দ, তোমরা আত্মদ্বীপ হইয়া চল,—আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ অনন্য-শরণ।

আনন্দ, ভিক্ষু কিরূপে আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করিতে পারে? (বলিতেছি:) এই শাসনে স্থিত ভিক্ষু যখন কায়াতে কায়াই দেখিতে পায়, বেদনায় বেদনাই দেখে, চিত্তে চিত্তই দেখে—বীর্যবান্, বিবেচনাশীল ও স্মৃতিমান্ হয়,—মনে কোনও দুষ্ট চিন্তা রাখে না,—এইরূপ ভিক্ষুই আত্ম-দ্বীপ,

আত্ম-শরণ অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ ধর্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করে।

আনন্দ, বর্তমান সময়ে অথবা আমার অত্যয়ের [-মৃত্যুর] পর যাহারা আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবে ও যাহারা এই শিক্ষা কামনা করিবে—তারাই আমার ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রবর্তী হইবে।
—''মহাপরিনিব্বান সুত্ত'', ২।৩১ ('মহাপরিনির্বাণের কথা', অনুবাদ : সুকুমার দত্ত। দিল্লী : পাবলিকেশন্স্ ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং, ১৯৬০, পৃ. ৬১)

৩. *'গণ' ও সঙ্ঘ: নিয়মনীতি (সূত্র ২১)*

ভগবান্ আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন : ''আনন্দ, এ কথা কি তুমি শুনিয়াছ যে বজ্জিরা সকলে অভিন্নভাবে সম্মিলিত হয় ও বহুবার সম্মিলিত হয় ?'' উত্তরে আনন্দ বলিলেন, হ্যাঁ, আমি ইহা শুনিয়াছি। ভগবান্ বলিলেন : ''যতদিন বজ্জিরা অভিন্নভাবে ও বহুবার সম্মিলিত হইবে ততদিন তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই হইবে, হ্রাস হইবে না।'' পুনর্জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি কি শুনিয়াছ, আনন্দ, বজ্জিরা সকলে একত্র হইয়া সম্মিলিত হয় ও একতার সহিত পরিষদে বসে এবং বজ্জিদের (রাষ্ট্র সম্বন্ধে) যাহা করণীয় তাহা করিয়া থাকে ?''... [এরকম কয়েকটি প্রথার উল্লেখ করে বুদ্ধ বজ্জিদের প্রশংসা করেন। পরে ভিক্খুদের সাতটি 'অপরিহাণীয় (=যা ক্ষয়কে রোধ করে) ধর্ম'-র উপদেশ দেন। যেমন :] ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা সকলে একত্রিতভাবে সম্মিলিত হইয়া এক সঙ্গে উঠিবে বসিবে ও সংঘ সম্বন্ধে যাহা করণীয় তাহা এইভাবে (অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে) করিবে, জানিও ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি, ক্ষয় নাই।...

[''মহাপরিনিব্বান সুত্ত'', ১] ৪-৬—উৎস : পূর্বোক্ত (পরিশিষ্ট ২)।

৪. *ধনতৃষ্ণা প্রসঙ্গে (সূত্র ২৪)*

বুদ্ধ বললেন : পৃথিবীর ধনী লোকদের দেয় যে সম্পদ তারা পেয়েছে, হের বশে তারা তা দান করে না। পাওয়া ধন তারা সঞ্চয় করে, আরও বেশি ভোগ করতে চায়।

পৃথিবী জিতে রাজা সসাগরা পৃথিবী শাসন করে, সমুদ্রের এপারে তৃপ্তি হয় না, সমুদ্রের ওপারটাও তার চাই।

রাজার মতো অন্য লোকরাও তৃষ্ণা (-লোভ, কামনা)-শূন্য হয়ে মরতে পারে না। ক্ষীণ হয়ে সে দেহত্যাগ করে। পৃথিবীতে কামনার তৃপ্তি হয় না। —''রট্‌ঠপাল সুত্ত'' ('মজ্ঝিম নিকায়' ৩২, ৪।১৫)

৫. *দারিদ্র্যই সর্বপাপের হেতু (সূত্র ২৮)*

[বুদ্ধ বললেন :] এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্রের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে অত্যাচারের প্রাবল্য হইল, উহার ফলে প্রাণনাশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, উহার ফলে মিথ্যা বাক্য, উহার ফলে পিশুন বাক্য, উহার ফলে ব্যভিচার, উহার ফলে কর্কশ বাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপ : উহার ফলে লোভ ও বিদ্বেষ, উহার ফলে মিথ্যা দৃষ্টি, উহার ফলে অধর্ম্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম, উহার ফলে মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল।...

—''চক্কবত্তি-সীহনাদ সুত্ত'' (দীঘ নিকায়, ২৬।১৮। অনুবাদ : ভিক্ষু শীলভদ্র। কলকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, খণ্ড ৩, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২)

সপ্তর্ষির হুইস্‌ল

বিরাম মুখোপাধ্যায়

ভোরালি রোশনচৌকি নেই ঝাঁপি-ঝাঁপি ফোঁস ফোঁস—
গত রাত-বারোটার কাঁটা দুটো বুকে পিঠে ব্যথা,
ললিতা-বিশাখা রাতকাবারের নেশায় টুম্বুর
ঘরন্তীর বাঁকা ঠোঁটে একদানা খাড়ি মসুরের
হাসি ; ম্যাজমেজে মেঘলা সকালে অভিভাবকের
চড়া কাপ্তেন-মেজাজ : সান্ত্রিরাও ছিচ্‌কে রোমিও !

বকেয়া পাহারা কাঁটা ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে অন্য বিট-এ
কিটকিট শব্দ তুলে চৌমাথার নিত্য জ্যামজট—
প্রভাতী-দৈনিকে তিন-তিনজন সীমান্ত প্রহরী
জলে-ডোবা বুড়বুড়ি, ঘিয়া-কুস্তি মোহনার চরে
বডিগার্ড লাইনের ড্রিল ছিট্‌কে ডুবলো গভীর—
গভীর পাঁকের নিচে, ভাঙাচাঁদ-টুপিও ডুবেছে ;
রাশি-লগ্নে যে যার স্বস্থানে নেই উদ্‌ভ্রান্ত সন্ন্যাসী।

হাতির পিঠের ঠিক দু-মিটার চিত্রিত কম্বল
মাহুতের ডাঙস মানে না, লটপট হৃদয়ের
ওম ফোঁটা-ফোঁটা মধু মোম নতুন আলোর মানে
সামাজিক অষ্টসিদ্ধি পণ্ডযজ্ঞ হাড়ে-হাড়ে জানে
নিজ-নিজ আলতামিরা ছায়াগুহা প্রাঞ্জল প্রতীক
কোড ম্যানুয়াল গিঁটজট আলোর ঝাঁপির ডালা....

শহরতলির হেলাফেলা হেমলতা প্রেমলতা
হাবুসখানায় শুয়ে বলাৎকার-লজ্জামুখ ঢাকে
আলোছুট দেয়ালের পাঁজরার নোনার আড়ালে
ঝুলকালি ধুলো ঝেড়ে দু-পোঁচ টাটকা কলিচুন
ফেরাবার দায় কার ? ঋতুর উৎসব সোনা-ছাপ
চিঠি চাঁদা-আদায়ের সম্মত মহাদলপতি আমি।

লম্বা দুয়ো দিয়ে-দিয়ে চিৎবিত্তি ললিতা-বিশাখা
আঁচল কাঁচুলি পেটিকোট রহস্যের বিকিকিনি
ইতিউতি চর্চাচুক্তি পসরার ভাঁজ ভেঙে-ভেঙে
এসপ্লানেড-টালিগঞ্জ আপডাউন মেট্রো-সাঁতারে
বয়েসের নগ্‌দানগ্‌দি যোলো শীতলে সুস্থির—
ডুবে-যাওয়া তিন-তিনটে সান্ত্রির শোক অবান্তর....

ইত্যাদি ইত্যাদি শববাহী দিন দুপুর সায়ম,
বাতিদান নেই, জ্যোৎস্নাভেজা অন্ধকার চিরে-চিরে
চু-কিতকিত মেঘদৌড় উচ্ছ্বাসের অভ্র-ময়দান
সপ্তমীর আশ্বিন-আকাশ চুপি চুপি ভাঙাচাঁদ
স্টপ্‌ওয়াচ-ইশারায় সপ্তর্ষির তীব্র হুইস্‌ল।।

ব্যর্থ পরিক্রমা

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

অন্যদিকে নিয়ে যাও, মনে করো। কিন্তু
অর্থহীন সেই পরিক্রমা।
বিপরীতমুখী হতে গিয়ে
তুমি আরো আশ্লেষ-সঙ্গিনী।
বিপরীতমুখী স্রোতে তুমি আরো তীব্র
স্রোতস্বিনী। অবগাহনের জন্যে অনন্ত
সাগর।

বীতরাগ মুক্তার সদৃশ।
তাচ্ছিল্যের উচ্ছ্বত ঝর্না অজস্র
সৌরভে। দূরত্বে সুন্দর রাত্রি
কাছে আনো তুমি। তোমার অনীহা-দৃশ্যে
দেখা দেয় রূপবতী চাঁদ—
সে চাঁদ ছড়ায় আলো হৃদয়ের
সুহৃদ-সোহাগে। কৌমার্য ফুলের মতো
দেখা দেয় প্রস্ফুটিত রাগিণীর
সুখে।

অন্যদিকে যতো যাও। আমি জানি
ব্যর্থ পরিক্রমা।

রোদের জলের নদী

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

রোদের জলের নদী কোন্ দিকে যায়?

কুমারী মেয়ের বুক লজ্জা কুড়ায়
দুটি হাতে ঢেউ তুলে স্মৃতির ঝিনুক
হিম লাগা অবেলায় এই টুকু সুখ
চুপি চুপি কেন নীল চাবুক নাচায়?

রোদের জলের নদী ধুয়ে ফেলে পাপ।

ভেঙে ফেলে একা একা কে কার মৌচাক?
ফুলে ফুলে পুড়ে যায় ঈশ্বরের মুখ
সোনার প্রতিমা ভাসে পাতার ভেলায়
দুটি চোখে দিন রাত দেখার কৌতুক
ফণা তুলে খেলা করে রক্তে কাল সাপ।

রোদের জলের নদী ধুয়ে ফেলে পাপ
সমুদ্রকে ছুঁতে যায় এই তার সুখ।

পক্ষহীন দূরত্ব রেখা

হোসাইন কবির

নদী থেকে ফিরতি পথে
তুমুল আঁধার,
পাখা মেলে কালো চাঁদ—
বয়সী বৃক্ষের ছায়ায় ;

কার কথা মনে পড়ে!

রোদ্দুরে জ্বল জ্বলে চোখ—বায়সদুপুর,
শিরায় শিরায় টান বেগবান নদী ;
হাওয়ায় উড়ছে পালক, সান্ধ্য প্রণয়গামী পাখির—
পক্ষহীন দূরত্ব রেখায়।

আকাশের ভেতর থেকে
আমাদের দেখে নেয়
পৃথিবীর সমস্ত আলো
কালো চাঁদ
তুমুল আধার।

নতুন বিশ্ব রাজনীতি এবং ভারত

জয়ন্ত কুমার রায়

উনিশশো নব্বই-এর দশকে একটি কথা প্রায়শই শোনা যাচ্ছে : বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন ব্যবস্থার (বা অব্যবস্থার?) উদ্ভব ঘটেছে। এই নতুনত্বের স্বরূপ বুঝতে বা বোঝাতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অতিবৃহৎ শক্তি হিসাবে আবির্ভাবের ওপরই লেখক-পর্যবেক্ষকেরা জোর দিচ্ছেন। এটা বোধহয় একটু অবাস্তব মূল্যায়নই হয়ে যাচ্ছে। কারণ এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এটা অনস্বীকার্য যে সামরিক প্রতিযোগী রূপে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ধান ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির আধিক্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এই অমিত সামরিক বল আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। যেখানে প্রয়োগ সম্ভব—যেমন উপসাগরীয় সমরে ইরাকের বিরুদ্ধে—সেখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতা প্রকট। ইরাকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে শুধুমাত্র জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যদের সম্মতির ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নির্ভর করতে হয়েছে, তাই নয়, জাপান ও জার্মানির আর্থিক অনুদানের ওপরও নির্ভর করতে হয়েছে।

অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগীবিহীন সামরিক পরাক্রমের ওপর জোর দিলেও এটিকে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির নতুনত্ব বলে চিহ্নিত করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিবিধ জটিল গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বোধ হয়, বিশ্বরাজনীতির অভিনবত্বের ওপর জোর না দিয়ে পরিবর্তনশীলতার ওপর জোর দেওয়াটাই বাস্তবসম্মত হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য — অর্থাৎ প্রতিটি রাষ্ট্র উচিত/অনুচিত উপায়ে সফল/বিফলভাবে নিজের নিজের স্বার্থরক্ষায় নিয়ত ব্যস্ত থাকবে — তথাকথিত নতুন বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অটুট আছে। অতএব, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট—যেমন খনিজ তেলে সমৃদ্ধ কুয়েতে — সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ও তার সহযোগী রাষ্ট্ররা) সামরিক বল প্রয়োগ করতে প্রস্তুত। যদি কুয়েতে কেবল খেজুর উৎপন্ন হত, তাহলে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটত না। নানা দেশে — যেমন মিয়ানমারে বা ফিজিতে—অতীব ন্যক্কারজনকভাবে মানবিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে। ঐসব দেশে সামরিক হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন বোধহয় হত না, শুধুমাত্র ভীতিপ্রদর্শনই যথেষ্ট হত, এবং ফলে শাসকবর্গের কার্যধারায় পরিবর্তন আসত, মানবিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা ঘটত। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (ও তার সহযোগী রাষ্ট্রদের) কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ মিয়ানমারে বা ফিজিতে বিপন্ন হচ্ছে না। অতএব, হস্তক্ষেপও ঘটছে না। যে ব্যাপারে আমেরিকা ও তার সহযোগীবৃন্দ মিয়ানমারের ওপর ক্ষুব্ধ — বিপজ্জনক মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও চোরাচালান — সে ব্যাপারেও মিয়ানমার সম্পত্তি চীন ও থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে একত্রিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে — ঐ উৎপাদন ও চোরাচালান বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রশমিত করেছে। কুয়েতের নাগরিকদের মানবিক অধিকারের মূল্য মিয়ানমার বা ফিজির নাগরিকদের মানবিক অধিকারের চেয়ে বেশি। এই সামান্য উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, বিশ্ব রাজনীতির মৌলিক চরিত্রে বিরাট অভিনবত্বের নিদর্শন নেই। কিন্তু নিদর্শন আছে পরিবর্তনশীলতার।

পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ সূচক ঠাণ্ডা লড়াই-এর দুই শিবিরের মধ্যে একটির বিলুপ্তি। ভারতের মতো নিজেটি দেশের কূটনৈতিক ধ্যান-ধারণা, বক্তব্য - করণীয়ের ওপর এই পরিবর্তনের অভিঘাত গভীর। অতীতে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায়, দুই শিবিরের—বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের — মতবৈষম্য ছিল অনুমানযোগ্য, এবং তদনুযায়ী ভারতের মতো নিজেটি দেশের বক্তব্য পদক্ষেপও ছিল প্রায় পূর্বনির্ধারিত। ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানে দশকের পর দশক ঐ লড়াই-এর পরিমণ্ডলে

অভ্যস্ত ভারতীয় কূটনীতিকবৃন্দ (বিশেষত যারা সোভিয়েট ইউনিয়নের ভক্ত) দ্বিধা, আশঙ্কা ও অস্বস্তিতে জর্জরিত হন। কর্মরত কূটনীতিকরা অবশ্য তাদের মনোভাব অব্যক্ত রাখেন। কিন্তু যেসব অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় কূটনীতিক অতীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরাগী হিসেবে বিপুল ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন, তারা কিন্তু জাতীয়/আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে নিজেদের ভাবনা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন না। তাদের বক্তব্য ও অঙ্গভঙ্গী থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানে বেশ কিছু ভারতীয় কূটনীতিক (অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত) অতিশয় বিপর্যস্ত—প্রায় অনাথ—বোধ করছেন। এটা শুধু অভ্যাসের দাসত্ব নয়। এটা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কিছু ব্যর্থতা ও বৈপরীত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যেগুলি ঠাণ্ডা লড়াই-এর কৃয়াশায় ঝাপিকটা ঢাকা ছিল।

এই অনাবৃত অকর্মণ্যতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে গেলে নিজেটি নীতির তত্ত্ব ও বাস্তবের যে বিশাল ব্যবধান সেটি উপলব্ধি করতে হবে। তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার ভালোমন্দ বিচার করার স্বাধীনতা জোটবদ্ধ দেশগুলির নেই, কিন্তু নিজেটি দেশের আছে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীতই ঘটেছে—দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে, এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, একটি নিজেটি দেশ ধরাবাঁধা পথেই কূটনীতি পরিচালনা করেছে। স্বাধীন পদক্ষেপ নেওয়া দূরে থাক, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার বিলাসিতাও একটি নিজেটি দেশকে বর্জন করতে হয়েছে, যাতে দেশের স্বার্থ বিপন্ন না হয়। এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারব যদি ১৯৫৮ সালে লেবাননে ও ১৯৬১ সালে কিউবায় মার্কিন হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে ও ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েট ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে, ভারতের বিবৃতিগুলি পর্যালোচনা করি। কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্য ছিল ভারতের সাধ্যাতীত। অতএব, বিবৃতি মারফতই নিজেটি নীতির তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাপ্তব্য স্বাধীনতার পরিমাপ করতে হয়, এবং দেখা যায় সে সত্যকে অস্বীকার করা ও এড়ানোর মধ্যবর্তী স্থানে বিচরণ করার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো স্বাধীনতা উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের ছিল না। ভারতের এই আচরণ কিন্তু অন্যায় ছিল না, কারণ দেশের স্বার্থে নানাবিধ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, সামরিক সুযোগ সন্ধানে ঐ আচরণ ছিল অপরিহার্য। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে ঐ আচরণের মর্মবস্তু ছিল স্বাধীনতাহীনতা, যা নিজেটি নীতির তত্ত্বের পরিপন্থী।

ঠাণ্ডা লড়াই ও সোভিয়েট শিবিরের অবলুপ্তির ফলে নানা ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির শৃঙ্খলমুক্তি ঘটেছে। কারণ স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ের সমস্যার মোকাবিলায় মার্কিন-সোভিয়েট বিরোধ-জনিত পরাধীনতার বা আড়ষ্টতার অবসান ঘটেছে। এই নবলব্ধ স্বাধীনতা ভারতীয় কূটনীতিকদের সামনে সৃষ্টি করেছে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের অভূতপূর্ব সুযোগ। কিন্তু যারা অতীত সব ব্যর্থতা-শৈথিল্য-জড়তার দায় ঠাণ্ডা লড়াই-এর ওপর ন্যস্ত করে চিন্তা ও দায়মুক্ত থেকে পূর্বনির্ধারিত পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তিতে আসক্ত হয়েছিলেন, তারা স্বাধীনতার ভয়ে আক্রান্ত। স্বাধীনতা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে প্রতিনিয়ত উৎকর্ষ প্রমাণের জটিল দায়িত্ব। বন্ধনহীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য অতএব প্রয়োজন দায়হীনতার আশু নিবাসন।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে কূটনৈতিক সক্রিয়তা, উদ্ভাবনশীলতা ও গতিময়তার প্রয়োজন—সুখের বিষয়—নরসিমহা রাও সরকারের আমলে ভারতীয় কূটনীতিকবৃন্দ তার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। অর্থাৎ, যারা ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানে অসহায় বোধ করছিলেন, তারা এবং অন্যান্যরা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। এ প্রসঙ্গে ইসরায়েলকে ভারতের পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের বিষয়টি ওঠে। দশকের পর দশক ইসরায়েলকে এই স্বীকৃতি না দেওয়া ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কারণ যে দেশের সঙ্গে ভারতের সরাসরি বিরোধ আছে, যেমন পাকিস্তান, তার সঙ্গে যদি পুরোপুরি কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়, তাহলে যে দেশের সঙ্গে ভারতের কোনো সরাসরি বিরোধ নেই, যেমন ইসরায়েল, তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করা একেবারেই যুক্তিসম্মত নয়। তাছাড়া, এই ইসরায়েল-বর্জন নীতি ছিল একটি অমার্জনীয় ভ্রান্তি। কারণ, ইসরায়েলকে ভারত স্বীকৃতি দিল বা না দিল তার ওপর প্যালেস্টাইনীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ বা আরব-ইসরায়েল সম্পর্কের উন্নতি অনুমাত্রও নির্ভরশীল ছিল না। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ভারতের ইসরায়েল-বর্জন নীতি ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর ও অকার্যকর।

তাছাড়া, অতীতের এই ইসরায়েল-বর্জন নীতি ভারতের পক্ষে ক্ষতিকরও ছিল। যে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান-প্রীতি ভারতের অগ্রগতির পক্ষে নানারকম বিঘ্ন

সৃষ্টি করেছিল, সে সময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত-বিরোধিতা অনেকটা প্রশমিত করার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া, বর্তমানে পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি উন্নয়নের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার জন্যও বোধহয় ইসরায়েলের সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্য অতীতের অস্পৃশ্যতা নীতি স্মরণ করে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্যালেস্টাইনীয়দের যথার্থ দাবি পূরণের ক্ষেত্রে ভারত-ইসরায়েল সুসম্পর্ক কোনো প্রতিবন্ধক নয়। বরং, এই সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে পশ্চিম এশিয়া সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুষ্ঠু ও মর্যাদাপূর্ণ আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারতের উচিত পদক্ষেপ নেওয়া সহজ।

এই মুহূর্তে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার ইউরোপীয় মিত্রদেরও নানা ব্যাপারে গভীর মতবৈষম্য আছে, অতএব ভারতের সঙ্গে মতবৈষম্য থাকাটাও স্বাভাবিক। বিশেষত, যখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অতিবৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বের প্রধান শক্তিরক্ষক মনে করে, এবং নিজের কাজের সুবিধার জন্য কিছু কিছু সিদ্ধান্ত অন্যান্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, পরমাণুঅস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ সমঝোতার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুই ব্যাপারে কিন্তু বিশ্বের ধনী দেশগুলি—অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রবৃন্দ এবং জাপান—সহমত পোষণ করে। ভারতের তুলনায় অনেক বেশি সামরিক শক্তির অধিকারী চীন পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মার্কিন ইচ্ছা মেনে নিয়েছে। এর জন্য অবশ্য ভারতের বামপন্থী রাজনীতিকরা চীনের নিন্দা করে নি, কিন্তু ভারত যদি চীনের পথ অনুসরণ করে তখন এই বামপন্থীরা ভারত সরকারকে মার্কিন ক্রীড়নক আখ্যায়িত করে নানাবিধ কটূক্তি বর্ষণ করবে। মেধাজাত সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও মার্কিন নির্দেশ চীন মেনে নিয়েছে—ভারত এখনও মানে নি—কিন্তু ভারতীয় বামপন্থীরা এজন্য চীনের নিন্দা করেছে বলে শোনা যায় নি। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে শেষ পর্যন্ত হয়তো ভারতকে পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি এবং মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে মার্কিন দাবি মেনে নিতে হবে, এবং ভারতের বামপন্থীরা তখন ভারত সরকারকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করবে।

এসব সমালোচনার আশঙ্কার দ্বারা অবশ্যই ভারতের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। আবার নীতিবাগীশ হয়ে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র নীতিকে অনড় করে রাখাও উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, অনেক সময়েই আমরা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়েছি—দেশের বাস্তব অথবা কাল্পনিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। তিব্বতীদের ওপর চীনের অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ আমরা করি নি। ভারতীয় মুদ্রা ও সোভিয়েত রুবল-এর বিনিময় হার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যা হওয়া উচিত তার চাইতে রুবলের মাত্রাতিরিক্ত বেশি মূল্য দিয়ে অতিবৃহৎ শক্তি প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নকে পুষ্ট করেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন ও ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে আগমনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করি নি। এই ধরনের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া সহজ, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। অতএব, নিছক সুনীতির দোহাই দিয়ে যেসব মার্কিন দাবি চীনও মানতে বাধ্য হয়েছে সেগুলি অগ্রাহ্য করা ভারতের পক্ষে সমীচীন নয়, আর অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তা সম্ভবও হবে না।

বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে তাল রেখে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যে ভাবাবেগবর্জিত তৎপরতা ও নমনীয়তা প্রয়োজন, ভারতের পররাষ্ট্র নীতির নিয়মকেরা, মনে হয়, সেগুলি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত। তাই যখন রাশিয়া থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি আমদানির ব্যাপারে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল, ভারত কোনোরকম উগ্র বা অশোভন প্রতিবাদ করে নি। তবে করে কোনো লাভও হত না। আবার, ভারতে প্রস্তুত ওষুধের মার্কিন দেশে আমদানির জন্য পাঁচ প্রতিশত শুল্ক আরোপে আমরা অখুশি। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে যেমন, তেমনি এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তেও ভারত তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সংযতভাবে ব্যক্ত করেছে। ভারত নিশ্চয়ই অখুশি হয়েছে, কিন্তু নিগৃহীত বোধ করে নি। বিরোধীদের উশকানি সত্ত্বেও সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবমাননা করে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে নি। ভারত-মার্কিন নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া বাতিল করে নি। বরং, এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দুই

দেশের সামরিক সহযোগিতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরবর্তী যুগে ভারতীয় কূটনীতি যে পরিপক্বতা ও স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করেছে এটা তার একটা সুস্থ দৃষ্টান্ত।

অপর দৃষ্টান্ত হল কিউবাকে ভারত থেকে দশ হাজার টন চাল পাঠানোর সিদ্ধান্ত। কিউবার অনুরোধ ছিল যেন পাঁচ লক্ষ টন গম এবং এক লক্ষ টন চাল পাঠানো হয়। মার্কিন অভিলাষ ছিল, ভারত যেন কিছুই না পাঠায়। কিন্তু ভারত সরকার বিরোধীপক্ষকে দেখালেন যে তারা মার্কিন নীতির অন্ধ অনুসারী নন, আবার মার্কিন সরকারকেও খুব একটা অশ্রদ্ধা দেখালেন না। পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতিতে এটাই সঠিক পন্থা: দেশের স্বার্থ বিনষ্ট না করে, মহাশক্তির রাষ্ট্রকে অবমাননার সুযোগ বর্জন করে, মৃদু সংঘাত ও ব্যাপক সহযোগিতার মিশ্র পথ গ্রহণ করা। ভারতের চাইতে অতুলনীয়ভাবে অধিক শক্তিশালী দেশগুলিও এই একই পথ নিয়েছে। ভারতীয় পণ্যের ওপর পাঁচ প্রতিশত মার্কিন শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত যেমন হয়েছে, তেমনি ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে আমদানীকৃত তৈলবীজের ওপর একশত প্রতিশত শুল্ক চাপাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর জাপানের ওপর তো বিপুল পরিমাণ শুল্ক ও অন্যান্য শর্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপান ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নানাবিধ সংঘাত লেগেই থাকে। কিন্তু সহযোগিতাও থাকে অব্যাহত। রাশিয়া এই মুহূর্তে আমেরিকার তুলনায় হীনবল হলেও অসাধারণ সামরিক শক্তির অধিকারী। সেই রাশিয়াকেও জাতীয় স্বার্থে আমেরিকার নানা দাবি মেনে নিয়ে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত রাখতে হচ্ছে।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানে ভারতীয় কূটনীতি যে উচ্চতর বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছে তার আর একটি দৃষ্টান্ত হল বসুধরা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-এর ভাষণ। রিও ডি জানেইরোতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যাপারে আমেরিকা প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছে, ইউরোপের মিত্র দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার মতবৈষম্য প্রকট হয়েছে, এমনি এক পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রিও-তে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। এই বক্তব্যে আমেরিকার প্রতি নিন্দাবর্ষণের বিরাট সুযোগ ছিল। কিন্তু সংযত ভাষায় রচনাত্মক সমালোচনা মারফত ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মনে রাখা উচিত যে নীতিগতভাবে তীক্ষ্ণ আক্রমণের সুযোগ থাকলেই সে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। আমেরিকা না হয় মহাশক্তিধর দেশ, কিন্তু ভারতের তুলনায় নিতান্ত হীনবল দেশকেও যদি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা যায়, তাতে দেশের স্বার্থ সিদ্ধ হয় না। স্মরণে আনা উচিত যে ১৯৬০-এর দশকে নেপালের রাজা মহেন্দ্র যখন গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভূয়সী জ্ঞান বিতরণ করেন। তাতে কিন্তু ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হয় নি, ভারত-নেপাল সম্পর্কেরও উন্নতি ঘটে নি। অতএব, রিও সম্মেলনে প্রকাশ্যে সরবে আমেরিকাকে হতমান করার সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অসাধারণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য অনেক আন্তর্জাতিক ব্যাপারের মতো পরিবেশ দূষণের সমস্যাটি এত জটিল যে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাময়িক উত্তেজনা আহরণের মনোভাবের বশবর্তী না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা মারফত প্রকৃত সমাধানের প্রচেষ্টাই সঙ্গত। প্রধানমন্ত্রী নরসিমহারাও তাই করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যদিও আমেরিকা বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নিয়ন্ত্রণে গররাজী, এবং যদিও ভারত এজন্য আমেরিকার সমালোচনা করেছে, আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে অধিকতর বেশি উপযোগী। কারণ আমেরিকা যদি-বা অদূর ভবিষ্যতে শক্তির উৎস হিসাবে কয়লার বিকল্প উদ্ভাবন ও প্রয়োগে সক্ষম হতে পারে, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবপর নয়। প্রকাশ্যে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করে অপ্রকাশ্যে ঐ নীতির ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের না তোলাই উচিত।

পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত শক্তিমান একটি দেশের বা অনেকগুলি দেশের চাপ—যেমন পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ক্ষেত্রে—মেনে নেওয়া মানেই বশ্যতা স্বীকার করা নয়। যে ফ্রান্স সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজেকে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সামরিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, সে-ও আজ পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে এগিয়ে এসেছে। এটা হল বাস্তবতা স্বীকার :দেশের স্বার্থে বাস্তবসম্মত পথ অবলম্বন। আবার, একটি ক্ষেত্রে চাপ মেনে নিলেই সে-ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, এটাও ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েও ইরাক তার পারমাণবিক প্রযুক্তি উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছিল। কুয়েতে অপরিনামদর্শী আগ্রাসন না করলে ইরাকের পারমাণবিক প্রযুক্তি উন্নয়ন বিপর্যস্ত হত না। ভবিষ্যতে ভারতও যদি আমেরিকা ও অন্যান্য

পাশ্চাত্য শক্তির চাপে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়, তাহলে তার নিজস্ব পারমাণবিক প্রযুক্তি উন্নয়ন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে, এটা মনে করা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রাক্‌কালে—যেমন এই মুহূর্তে মার্কিন সরকার যে-সব চাপ অপরাপর দেশের ওপর প্রয়োগ করেন, সেগুলি সব ক্ষেত্রে কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ইঙ্গিতবাহী নাও হতে পারে, বরং নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার সাময়িক প্রচেষ্টা হিসেবেও সেগুলিকে দেখা যেতে পারে।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার মানসিকতা সর্বাগ্রে পরিত্যাজ্য: পুরাতন বাকধারা, পরিচিত কার্যধারা, এমন কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অহমিকাও। রাশিয়া তো তার অতিবৃহৎশক্তিসুলভ অহমিকা দ্রুত পরিত্যাগ করেছে, তাছাড়া যুগপৎ সমাজতান্ত্রিক বাকধারা এবং কার্যধারাও পরিত্যাগ করেছে। চীন তো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কার্যধারাকে প্রায় বর্জন করেছে, কিন্তু বাকধারাকে করে নি। ভারত তার নিজেটি নীতির বাকধারাকে বিসর্জন না দিয়েও অভিনব কার্যধারায় লিপ্ত হবার প্রস্তুতি প্রদর্শন করছে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতা ভারতের দ্বারা পুরাতনের বন্ধন ছিন্ন করার একটি সফল প্রচেষ্টা। এর গুরুত্ব কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক নয়, সামগ্রিকও নয়। আমেরিকা নিজেকে বিশ্বশান্তির প্রধান রক্ষক হিসেবে আস্ফালন করলে তাতে ভারতের অহমিকায় আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে আমেরিকার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা বাড়িয়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় ভারতের পক্ষে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব। এতে একটি দরিদ্র দেশ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করছে তার সার্থকতা নতুন মাত্রা অর্জন করবে। এমন কি, আমেরিকার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা সুষ্ঠু অবয়ব ধারণ করলে এক পর্যায়ে ভারতের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যয় কমিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ সম্ভব হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আফগানিস্তানে যে জঙ্গী মৌলবাদ শিকড় গেড়েছে, তা প্রথমে পাকিস্তানকে এবং অনতিবিলম্বে ভারতকে বিপদে ফেলবে। তখন, ভারত-পাক-মার্কিন যৌথ ব্যবস্থায় আফগানিস্তানকে পর্যুদস্ত করতে পারলে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির নতুন পথ প্রশস্ত হবে। ভারত ও পাকিস্তান হয়তো উল্লেখযোগ্যভাবে সামরিক ব্যয় কমিয়ে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা পরিহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক বেশি সম্পদ বিনিয়োগে সক্ষম হবে।

কিন্তু এর চাইতেও যা তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হল, আঞ্চলিক ও বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলায় এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে যৌথ নদীগুলির জলবণ্টন সমস্যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দুই যৌথ নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সংযোজক খাল নির্মাণ করতে পারলে দুই দেশই বন্যানিয়ন্ত্রণ, খালসেচ, নৌ-পরিবহণ, মৎস্যচাষ, বনসৃজন, পরিবেশ সংরক্ষণ, এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিপুলভাবে লাভবান হবে। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন বিশাল পরিমাণ অর্থ, যার যোগান আসতে পারে আমেরিকা, ধনী পাশ্চাত্য দেশগুলি ও জাপান থেকে। কিন্তু আঞ্চলিক ও বিশ্ব শান্তি রক্ষার বিষয়ে ভারতের সামরিক সহযোগিতা স্পষ্ট না হলে ঐ বিশাল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি হয়তো কেউ নেবে না। অথচ, সামরিক সহযোগিতা মারফত উপরোক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ভারতীয় কূটনীতির মর্যাদা মহত্বপূর্ণ পরিণতি লাভ করবে। আশা করা যায়, পুরাতনের মোহে আবিষ্ট না থেকে ভারত সরকার পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার উপযোগী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ মারফত ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে দ্বিধা করবেন না।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্-এর সেন্টিনারি প্রফেসর।

নিছক একা নয়

সুধাংশু ঘোষ

হাওয়াই চপ্পল বৃষ্টির জলে স্নান করে দারুণ সবুজ। ওটার রঙ যে এমন সবুজ, আগের দু-তিন মাস বোঝা যায় নি। ধুলোময়লায় ওর সবুজ রঙ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এখন বৃষ্টিতে ধুলোময়লা ধুয়ে যাওয়ায় ওটাকে খুব সবুজ দেখাচ্ছে।

পুরনো বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিক এগোতেই চপ্পলের স্ট্র্যাপ খুলে গিয়েছিল। তাই বিশু ঠেলাগাড়ির ত্রিপলের ওপর চপ্পল জোড়া রেখেছে, ফেলে দেয় নি। বৃষ্টির জলে খুব স্নান করছে ওটা, খুব আরাম করে নিচ্ছে। তবে বৃষ্টির জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বিশুর খালি পায়ের তলা দিয়ে, পাথর কুচি বিঁধছে, মরচে ধরা পেরেক অথবা ধারালো কাচের টুকরো পায়ে ফুটে গেলে ঝামেলা হবে।

অসময়ের ঝড়বৃষ্টি। সবে তো আশ্বিনের দশ-এগারো দিন হয়েছে। পুজোর সময় বৃষ্টি হয়। বিশু আগের দু-বছরই পুজোর সময় বৃষ্টি দেখেছে। কিন্তু পুজোর এখনো তো অন্তত দু-সপ্তাহ দেরি। এখনই এমন ঝড়বৃষ্টি অস্বাভাবিক।

বড়ো দুর্যোগ আজ। দারুণ ঝড়বৃষ্টি। তবু আজই বাড়ি বদল না করে নিশিকাকার উপায় নেই। কয়েক বছর পুরনো বাড়ির ভাড়া দেয় নি নিশিকাকা, দিতে পারলেও দেয় নি—ওই রকমই মানুষ। আজই পুরনো বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে, আজ রাত্তিরের মধ্যেই, না হলে কাল দিনেরবেলায় মুশকিল হতে পারে।

নতুন বাড়িতে পৌঁছতে এখনো বাঁক ঘুরতে হবে দু-বার। সন্ধে হয়ে গেল, রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। লোকজন রাস্তায় খুব কম, আকাশ ভেঙে নেমেছে আজ, পায়ের গোড়ালি অব্দি জলে ডুবে যাচ্ছে, আরো বাড়ছে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। বিশুর হাতে ছাতা, তবু পুরো ভিজে যাচ্ছিল। ছাতার একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে, উলটে যেতে পারে যে কোনো সময়।

ঠেলাওলা দুজন, মাথায় গামছা জড়ানো, জন্তুর মতন ঘাড় বেঁকিয়ে এগোচ্ছে, জন্তুর মতন ফোঁসফোঁস করছে হয়তো, বৃষ্টির শব্দে অন্য কিছু শোনা যায় না। ঠেলাটা নিশ্চয়ই খুব ভারী হয়েছে। উনুন, বালতি, বাসনকোসন, বিছানা, তক্তপোশ, বাক্স, আলনা সব একটা ঠেলায় বোঝাই করে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বিশুর সন্দেহ, যেমন তেরছা হয়ে ঝাঁকঝাঁক তীরের মতন আসছে বৃষ্টি, ত্রিপলের ফাঁকফোকর দিয়ে জল ঢুকে বিছানাটিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে বোধ হয়।

ঝড়বৃষ্টি কমলে কাকা-কাকী, বুনু আর তার পাঁচ মাসের ভাই পরে আসবে। ভারী জিনিসপত্তর নিয়ে বিশুর আগে পৌঁছে যাওয়া দরকার, নতুন বাড়ি একটু সাফসুফ করা দরকার। ঠেলাওলাদের পাওনা নতুন বাড়ি মালপত্তর নামিয়ে বিশুকেই মিটিয়ে দিতে হবে। ওদের পাওনা টাকা নিশিকাকা বিশুর কাছে দিয়ে দিয়েছে, পকেটে রয়েছে, ভিজে না যায়। রাস্তায় লোকজন বেশি না থাকলেও গাড়িঘোড়ি কম নয়। একটা ট্যাক্সি বিশুর মাথা অব্দি নোংরা জল ছিটিয়ে চলে গেল। বিশু দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি করল, শুয়োরের বাচ্চা!

বুনুর নাচের মাস্টার নতুন বাড়িতে আসবে নাকি? লোকটা আব্দি বা মলমলের ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে আসে। লম্বা চুল, খুব রোগা আর ফরশা, প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করলে ঘাড়ের হাড় ঠেলে ওঠে। বয়েস তিরিশের কম নয়। সপ্তাহে একদিন বুনুকে নাচ শেখায় লোকটা। প্রথম দিকে দু-একবার মাইনে পেয়ে থাকলেও, এখন নিশ্চয়ই পায় না, নাচের মাস্টারকে ঠিকঠাক মাইনে দেবার মানুষ নিশিকাকা নয়, তবু সপ্তাহে একদিন আসে লোকটা। নিশিকাকা জানে, মাইনে না পেলেও লোকটা আসবে। জীবনের এসব রহস্য নিশিকাকার জানা। ইদানীং বিশুও জানছে।

আজকাল নাচের মাস্টারকে দেখলেই বিশুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। লোকটা কেমন যেন ছাল-ছাড়ানো মোরগের মতন। এক বিকেলে নাচের কোনো একটা মুদ্রা

শেখাতেগিয়ে বুনুর গালে নিজের গাল ঘষছিল লোকটা। তারপর থেকে ওকে চা দেবার সময় ভুরু কুঁচকে তাকায় বিশু। মাইনে দেওয়া হয় না, তবে এক কাপ করে চায়ের বরাদ্দ রয়েছে, বিশুকে দিয়ে আসতে হয়। সেদিন বিশু চায়ের কাপ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বুনুকে জড়িয়ে নিয়ে তার গালে গাল ঘষছিল লোকটা। নাচের ওই ধরনের ভঙ্গি বিশু বিড়ির দোকানের ক্যালেণ্ডারের রঙিন ছবিতে দেখেছে। বুঝতে পারে, মাইনে না পেলেও লোকটা কেন আসে। এসব বুঝবার বয়েস বিশুর হয়েছে।

নতুন বাড়িতেও আসবে লোকটা। আসাই স্বাভাবিক। নিশিকাকার ওই একটিই মেয়ে বুনু। এত বছর পরে বুনুর একটি ভাই হয়েছে বটে, তবে মেয়ে তো ওই একটিই। কাকী তার নিজের সব অপূর্ণ সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করতে চায়। নাচের মাস্টারকে নিশ্চয়ই নতুন বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। অতএব আসবে, মাইনে না পেলেও আসবে, কারণ লোকটা বুনুর কাছে প্রশ্রয় পায়।

অনেকটা এইরকম এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধেয় বিশুর মা শেয়ালদা স্টেশন থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর মরেছিল। তারও আগে ট্রেনে কাটা পড়েছিল বিশুর বাপ। গ্রাম সম্পর্কের কাকা নিশিকান্তর বাড়িতে মার সঙ্গে আগে একবার গিয়েছিল বিশু। কাকা খুব ভালোমানুষের মতন কথা বলেছিল। বিশুকে রাখতে চেয়েছিল তার বাড়িতে। বলেছিল, বাড়ির ছেলের মতন থাকবে, কাজকর্মে একটু সাহায্য, পড়াশোনার দিকে মন থাকলে বুনুর পুরনো বই নিয়ে পড়বে, স্কুলে না গেলে কি আর পড়াশোনা হয় না। মা-র মৃত্যুর পর দু-বছর আগে এক বিকেলে বিশু খুঁজে খুঁজে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে নিশিকাকা তার কথা রেখেছিল, বিশুকে তাড়িয়ে দেয় নি।

মার মৃত্যুর সময় বিশুর বয়েস ছিল পনেরো। তারপর এই দু-বছরে তার মনের এবং শরীরের বয়েস দ্রুত বেড়ে গেছে, বুদ্ধির দরজা-জানলা খুলে গেছে অনেকগুলো। বুনুর পুরনো বাতিল বই কিছু পেয়ে যায় সত্যি, প্রচুর কসরত করে আদায় করতে হয়, কিন্তু পড়বার সময় পায় না তেমন, আজকাল পড়বার ইচ্ছেটাও কমে আসছে। বাজার, রেশন, দুধ, কেরোসিন, বুনুর ভাই হওয়ার আগে-পরে রান্না, সব বিশুর হাতে।

মাসের মধ্যে দশদিন নিশিকাকা মাতাল হয়ে বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফেরে। তাকে খাইয়ে, সব গুছিয়ে নিজের বিছানায় যেতে বিশুর রাত দুপুর। পুরনো বাড়িতে বিশুর বিছানা ছিল সিঁড়ির তলায়। নতুন বাড়িতে কেমন শোবার জায়গা পাবে এখনো জানে না। ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিশিকাকা কী যেন করে, ঠিক মাস মাইনের চাকরি মনে হয় না। বাজার করার টাকা থাকে না এক-একদিন। বাইরের লোক এলে নিশিকাকা বাড়ি থাকলেও মাঝেমাঝে বিশুকে সদর দরজায় গিয়ে বলতে হয়, কাকা বাইরে গেছে, ফিরবে না এবেলা।

এই দু-বছরে দেখেশুনে অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে বিশু। মনের বয়স চটপট বেড়ে যাওয়ায় বিশু খুশি। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, কোথায় কী এবং কেন, তার মধ্যে নিজের একটু জায়গা করে নিতে পারবে এমন আত্মবিশ্বাস এসেছে। আসলে তার ভালো শরীরের বয়েস নিয়ে। হাতের পায়ের বুকের পেশীগুলো মেহনতের কাজ করবার সময় ফুলে-ফুলে ওঠে, থুতনিতে আর নাকের তলায় কটাশে রোঁয়াগুলো কালো হয়ে আসছে, নিজের গলার বদলে-যাওয়া গম্ভীর স্বরে নিজেই প্রথম প্রথম চমকে যেত।

বিশুর থেকে বছরখানেকের ছোটো হবে বুনু। অথচ এমন ভাব দেখায় যেন তার থেকে কত বড়ো। তুই তুই করে, আর বিশুকে বাধ্য হয়ে তুমি বলতে হয়। স্কার্ট পরে বুনু, যদিও শাড়ি পরা উচিত। বুনু ঘেন্না করে বিশুকে, প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়—তোকে আমার ঘেন্না। আবার তার অনেক গোপন ব্যাপার বিশু জেনে গেছে বলে বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না। পাড়ার এক মাস্তানের চিঠি আছে বুনুর কাছে, স্কুল পালিয়ে তার সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছে বুনু, নাচের মাস্টারকে গালে গাল ঘষতে দেয়, এমন আশ্চর্য পত্রিকা আছে বুনুর কাছে যার রঙিন ছবি দেখলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। বুনু জানে, এসব জেনে ফেলেছে বিশু। তাই বাড়াবাড়ি করতে পারে না, তাই বাতিল বইটই দেয়। এমনকি এক-এক সময় মধুর করে বিশুদা বলে ডাকে।

বিশুকে ঘেন্না করে বুনু, আবার যে-শরীর শাড়ি দিয়ে ঢাকা উচিত, ইচ্ছে করে তার ঢেউ তুলে লোভ দেখায়, লোভ দেখিয়ে ভালো বাড়ায়। বুনুর গোপন ব্যাপার একটাও ফাঁস করে না বিশু, তবে ইদানীং বুদ্ধির দরজা-জানলা খুলে যাওয়ায় নিশিকাকা বেহেড হয়ে বেশি রাত্তিরে ফিরলে তার পকেট থেকে পয়সাটয়সা ঝেড়ে দিয়ে বিড়িফিড়ি খায়। রাত দুপুরে সিঁড়ির তলায় শুয়ে ঘুম আসতে দেরি হলে অথবা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে ময়লা তোশকবালিশ ছিঁড়ে

ফেলার তীব্র বাসনা হয়।

খালি পায়ে ঠেলার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বিশু দাঁতে দাঁত চেপে বুনুর উদ্দেশে মনেমনে বলছিল, আমিও তোমাকে ঘেন্না করি। দু-সারি দাঁতের মধ্যিখানে যেন বুনুর ফোলা-ফোলা আহ্লাদী ঠোঁট। ঠিক তখন বাঁ পায়ে একটা পাথরকুচি বিঁধে গেল। ঠিক তখন সামনেই নতুন বাড়ি, বন্ধ দরজায় তালা ঝুলছে, চাবি বিশুর পকেটে।

জলে ভেজা তালা খুলতে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। মালপত্তর নামিয়ে পাওনা মিটিয়ে দিতে চলে গেল ঠেলাওলারা। পুরনো বিবর্ণ একতলা ছোটোবাড়ি। ইলেকট্রিকের তার আছে, মিটার নেই, সুইচ টিপলেই আগের বাড়ির মতন আলো জ্বলবে না। বিজলিবাতি জ্বলার ব্যবস্থা নিশিকাকা পরে করবে। এখন দু-দশদিন হ্যারিকেন জ্বলবে। বিশু এসব জানে, তাই একটা হ্যারিকেন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সন্ধে উতরে গিয়ে এখন রাত্তির। বাইরে রাস্তায় বৃষ্টি ভেজা আলো, বাড়িটার ভেতরে ঘন অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি তেমনই ঝরছে, আরো বেশি খেপে যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া, কেমন হিংস্র হয়ে উঠছে। একা অন্ধকারে বসে ভিজে দেশলাই দিয়ে ভিজে হ্যারিকেন জ্বালতে মেজাজ খিঁচড়ে গেল বিশুর।

অনেকদিন কেউ বাস করে নি এই বাড়িতে। মেঝেয় ধুলো, ছেঁড়া কাগজ, পাতাপুতি জমে আছে পুরু হয়ে। মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে ভিজে চুলে, নাকের ডগায়। এই বাড়ির মধ্যে কেউ বোমা পেটো পাইপগান লুকিয়ে রাখে নি তো! অল্প দিনের মধ্যে কেউ অবশ্য এবাড়িতে ঢুকেছে মনে হয় না।

অন্তত একখানা শোবারঘর ওদের জন্য ধুয়েমুছে রাখতে হবে। রান্নাঘরটা একটু সাফসুফ করে উনুন, কয়লা, টুকরো কাঠ, চাল, ডাল, নুন, তেল গুছিয়ে রাখা দরকার। ওদের তো অল্প পরেই এসে পড়বার কথা। কিন্তু এইটুকু বাচ্চা নিয়ে কি করে আসবে আজ রাত্তিরে! ঝড় তো আজ সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রচুর জল জমে গেছে রাস্তায়। ট্যাক্সি মিলবে? অথবা দুটো রিকশা পাবে? ওদের সঙ্গে তো বেশ কিছু জিনিস রয়েছে।

আজ রাতে ওরা যদি না আসতে পারে? এই ঝড়বৃষ্টির রাত্তিরে একা এই বাড়িতে! এই প্রথম যেন ঠাণ্ডা বাতাস লেগে বিশুর সারা গা শিরশির করে উঠল।

জল চাই। অন্তত একটা ঘর মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। একটা বালতি মালপত্তরের মধ্যে থেকে বের করে এনে বাথরুমে ঢুকল। একপাল্লার দরজাটার কবজা ভেঙে খুলে গেছে। দরজাটা দেয়ালের গায়ে কাত করে রাখা। বিশু হ্যারিকেনটা রাখল চৌবাচ্চার পাড়ে। চৌবাচ্চায় জল নেই। জলের কলের মুখে ট্যাপ নেই, খুলে নিয়ে গেছে সম্ভবত আগের বাসিন্দারা, এক টুকরো কাঠ ঢুকিয়ে পিটিয়ে জলের পাইপের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে, জল পড়ছে না।

সিঁড়ির তলায় বিশু কয়েকখানা ইট দেখেছিল, তার একখানা নিয়ে এল। পাশ দিয়ে ঘা মেরে তার কাঁধ সমান উঁচু কলের মুখে সাঁটা কাঠের টুকরোটা খানিক আলগা করল। জল চুইয়ে পড়া শুরু হল। আরো কয়েকটা ঘা মারতে খসে পড়ল কাঠের টুকরোটা। সঙ্গে সঙ্গে তোড়ে জল বেরিয়ে এসে বিশুকে ভিজিয়ে দিল। হঠাৎ এমন ফিনকি দিয়ে জল বেরিয়ে এসে মাথায় চোখে মুখে বুকে লাগবে বুঝতে পারে নি। সময়মতন সরে যায় নি, সরে যাবার সুবিধেও তেমন ছিল না, স্নানের ঘরটায় জায়গা কম।

লোহার মরচে-ধোয়া কী ঠাণ্ডা জল! সেই বিকেল থেকে ভিজছে, তারপর এখন একেবারে নেয়ে উঠল। শীতকাল নয়, তবু বিশুর শীতের কাঁপুনি। চোখে, নাকে-মুখে জল ঢুকেছে। জলে মরচের গন্ধ। জল ঢুকে যাওয়ায় নাক জ্বালা করছিল।

যতটা সম্ভব সরে দাঁড়িয়ে জলের তলায় বালতিটা পেতে দিল। এক মিনিটে বড় বালতিটা ভরে গিয়ে জল উপচে পড়তে লাগল। জল পড়ছে খুব মোটা নালে, এই মুহূর্তে কানে কেবল জল পড়ার শব্দ।

চট করে পাইপের মুখ বন্ধ করতে না পারলে বারান্দা ছাপিয়ে শোবার ঘরে জল ঢুকবে, সব জিনিসপত্তর ভিজে গিয়ে জলে ভাসবে। স্নানের ঘরে কাঠের টুকরোটা খুঁজে পেল না। সেটা আর আস্ত নেই বোধ হয়। পুরনো বাড়ি থেকে উনুন আনা হয়েছে। কলঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে সেই উনুনের মধ্যে হাতড়ে কাঠের টুকরো পাওয়া গেল। সাইজমতন একটা নিয়ে ফিরে এল জল থই থই কলঘরে। ইটখানা খুঁজে পেয়ে তুলে নিল। কলের মুখ বন্ধ করতে আবার নাকেমুখে জল ঢুকল। দুবার ভট্ করে ছিটকে এসে কাঠের টুকরোটা বুকে লাগল। শেষবার এক হাতে পাইপের মুখে টুকরোটা চেপে ধরে অন্য হাতে খ্যাপার মতন ইটের ঘা মারছিল, দু-একটা আঙুল বোধ হয় থেঁতলে গেল।

তোড়ে জলপড়া যখন বন্ধ হল, বিশু হি-হি করে কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কলঘরের জলের মধ্যে কী একটা ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। জ্যান্ত। কী যে, বিশু বুঝতে পারল না অন্ধকারে। জলে ডোবা বালতিটা পড়ে রইল কলঘরে, নিভে-যাওয়া হ্যারিকেনটা চৌবাচ্চার পাড়েই রইল, বিশু চলে এল একটা শোবার ঘরে। দেশলাই বাক্সের কাঠিগুলো ভিজে গেছে, বারুদ গলে গেছে, আলো জ্বালানো যাবে না।

ন্যাংটো হয়ে হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে গা-মাথা মুছল। অনেক হাতড়ে নিজের একটা আধভেজা প্যান্ট পেয়ে পরল, জামা পেল না। চাদরটাদর কিছু জড়িয়ে বিছানার ডাঁইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল। কার বিছানার চাদর, তার নিজের নয়, কাকীর না বুনুর বুঝতে পারল না, বুঝবার ইচ্ছেও ছিল না। আগে কাঁপুনি থামানো দরকার।

জানলার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চুইয়ে রাস্তার সামান্য আলো ঘরে আসছিল। হিংস্র ঝড় দাপাচ্ছে, হিসহিস করে ঢুকে পড়ছে ফাঁকফোকর দিয়ে, বৃষ্টি চলছে সমানে। ওরা আজ রাত্তিরে আর আসতে পারবে না। চোখ বুজে আসছে, অথচ চোখ বুঝতে ভয়। চুইয়ে-আসা কৃপণ আলোয় দেখা যায় না কিছুই, তবু যেন সিলিং থেকে মাকড়সার জালের সঙ্গে কালো কালো ছিবড়ের মতন অন্ধকার ঝুলে আছে, দুলে দুলে এগিয়ে আসছে বিশুর চোখের কাছে। জ্বর আসছে নাকি? সারা গায়ে ব্যথা, মাথাটা ফেটে যাবে।

বিছানার ডাঁইয়ের ওপর কাত হয়ে বুকের কাছে পা গুটিয়ে শুয়ে বিশু মাঝেমাঝে ছেঁড়াছেঁড়া স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নে সেই সব গল্পের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল যা বুনুর বাতিল বইয়ে পড়েছে বারবার। যীশু আর বারাবাসের গল্পটা অনেকবার পড়েছে। যীশুর বদলে বারাবাসকে ছেড়ে দেওয়া হল, আর যীশুকে চড়ানো হল ক্রুশে। ওই দুজন বড়ো স্পষ্ট হয়ে আসছিল বিশুর স্বপ্নে।

কিসের শব্দে যেন বিশু মাঝরাত্তিরে একবার প্রায় জেগে উঠল। তখনো ওই দুজনের স্বপ্নে খানিক আচ্ছন্ন। আধাআধি জেগে উঠে ভাবল, আজ রাত্তিরে এই বাড়িতে একজন মরে যাবে। একজন মরলে বেঁচে যাবে আর একজন। কিন্তু এই বাড়িতে আজ রাতে সে তো একা। একা একই সঙ্গে কেমন করে মরবে, কেমন করে বাঁচবে? চেষ্টা করে দেখবে নাকি উঠতে পারে কিনা? উঠতে পারলে এবাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাবে! ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যেতে পারে? ট্রেনে কাটা পড়ার আগে তার বাবার একটা আড্ডাখানা ছিল, সেখানে মা-র সঙ্গে গিয়েছিল একবার, গিয়ে বাবাকে মাতাল অবস্থায় পেয়েছিল। তখন ঠিক বোঝে নি; পরে বুঝেছে, তার বাবা খারাপ লোকদের দলে ছিল। সেই আড্ডায় চলে যাবে বিশু, গিয়ে বলবে—আমি বলাইচাঁদ দত্তর ছেলে?. তার মা-বাবা দুজনই মরেছে অকালে। সেও কি অকালে মরে যাবে আজ রাত্তিরে এই ফাঁকা অন্ধকার বাড়িতে! দুম করে খেয়াল হল, এই বাড়িতে আজ রাতে আরো তো জ্যান্ত একজন রয়েছে, যে কলঘরের জলের ভেতর ঝাঁপাচ্ছিল। কে মরবে আজ এই বাড়িতে, সেই একজন, নাকি বিশু?

খানিক জেগে খানিক ঘুমিয়ে, খিদে টের না পেলেও তেষ্টায় কাঠকাঠ গলায় প্রলাপের মধ্যে মাকে কয়েকবার ডেকে বিশু রাত কাবার করে দিল। ভোরবেলায়, বৃষ্টি নেই ঝড় নেই, পুরোপুরি জেগে উঠল বিশু। ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরে আলো এসেছে। খুব নরম আলো। মাথার যন্ত্রণা অনেক কম। খুব পেচ্ছাপ পেয়েছে। একবারের চেষ্টাতেই বিশু উঠতে পারল। দেওয়াল ধরে ধরে চলে গেল বাথরুমে।

একটা মস্ত ইঁদুর মরে পড়ে আছে ঝাঁঝরির মুখে, জল খেয়ে ফুলে ঢাউস। কলঘরের জমা জল সরে গেছে, মেঝে শুকনো। কী আশ্চর্য, ঝাঁঝরির মুখে মরে পড়ে থাকা ইঁদুরটাকে বিশুর বরং সুন্দর লাগল। ছাই রঙের লোম পুরো শুকোয় নি, দুটো চিকন দাঁত সামান্য বেরিয়ে আছে। কী শান্ত! একটু হাসছে নাকি? ঝাঁঝরিতে পেচ্ছাপ করলে ওর গায়ে ছিটে লাগবে। বিশু ডান হাতে আলতো করে ইঁদুরটার ঘাড় ধরে তুলল, মোটেই ঘেন্না হল না। কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় এল, দেওয়াল ধরে আসতে হল না, মাথা বেশ সাফ, শরীর আর দুলছে না।

সামনের নালার পাড়ে একটা গাছের ডালের ওপর মরা ইঁদুরটাকে শুইয়ে রাখল বিশু। একটু পরেই হয়তো কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তবে এখন তো ওখানে থাক। রেখে চলে আসবার আগে হঠাৎ মনে হল, আড়াআড়ি দুটো ডালের খাঁজে যেখানে ইঁদুরটাকে রেখেছে সেটা একটা ক্রুশের মতন। ফিরে আসবার সময় সদর দরজা কেবল ভেজিয়ে রাখল। ওরা নিশ্চয়ই এখন আসবে।

নালার পাড়ে বসে পেচ্ছাপ করতে পারত বিশু, করল না। কাছেই একটু ওপরে ইঁদুরটা রয়েছে। চোখ বোজা, তবু দেখতে পাচ্ছে সন্দেহ হয়। বিশু জানে, ও মরে গেল বলে সে এখনো জ্যান্ত, এবং শরীর আর দুলছে না, মাথা সাফ।

নরম আলো একটু তেজী হলে, তখনো ঠিক রোদ ওঠে

নি, ওরা সামান্য জিনিসপত্তর নিয়ে এল। কাল তো বিশু প্রায় সবই ঠেলায় চাপিয়ে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটি ছাড়া ওরা সবাই রাত্তিরে খালি মেঝেয় পড়ে ছিল, ভালো ঘুম হয় নি। বাচ্চা কোলে নিয়ে কাকী এসে বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত দিল। হাত দিয়েই বলল, 'ইস, এই ঝামেলার সময় জ্বর বাঁধালি!'

নিশিকাকা একবার সামনে এসে দাঁড়াল। 'অত ভেজার জন্যেই জ্বরটা এসেছে। ক-টা বড়ি খেলেই সেরে যাবে। এনে দেব।'

বিশু আধবোজা চোখে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে পুরো চোখ খুলে তাকাল। কাচের গেলাসে দুধ নিয়ে বুনু সামনে দাঁড়িয়ে। বলছিল,'মা তোকে দুধটা খেয়ে নিতে বলল, বিশুদা।' বিশুর জল খাওয়ার আলাদা অ্যালিউমিনিয়মের গেলাস আছে, চায়ের জন্য একটা ফাটা কাপ। বুনুর হাতের কাচের গেলাসটায় ফুল লতাপাতা কাটা। দুধ থেকে অল্প ধোঁয়া উড়ছে। বাচ্চার জন্য কেনা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে কাকী দুধটা গরম করে দিয়েছে। বিশু ভালো করে তাকাল বুনুর দিকে। চুল এলোমেলো, শুকনো মুখ, জামাটা কুঁচকে গেছে। দুধের গেলাস বাড়িয়ে ধরা হাতে একটি সরু চুড়ি। সাদা দুধ, সরু চুড়িটা আর বুনুর ঘুম না-হওয়া চোখে কেমন মায়া জড়ানো।

নিজের মনের ভেতর মই নামিয়ে দিয়ে বিশু বুনুর প্রতি এতটুকু লোভ অথবা ঘেন্না খুঁজে পেল না। বরং স্নেহ, মায়া ইত্যাদি অনুভব স্পষ্ট হচ্ছিল। বুনুর হাত থেকে বিশু দুধের গেলাসটা নিল।

কবিতায় রাজনীতি : বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদ

সুজিৎ ঘোষ

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ দুটি ভিন্নভাষী মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটায়। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে অনুবাদ আছে বলেই বিশ্ব সংস্কৃতির সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। অবশ্য, সব সময় সমস্ত বিদেশী ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদে পড়ার সুযোগ আমাদের হয় না। অনেকসময় তা দু-হাত ফেরত বা আরও বেশি ক্রমান্বয় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়—যেমন তাজিক ভাষা থেকে রুশ ভাষায় তার থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাঙলায়। এ ধরনের অনুবাদে সাত নকলের আসল খাস্তা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই। তাছাড়া মূলের স্বাদ, ঘ্রাণ, বর্ণও সেখানে কতখানি বেঁচে থাকে, তা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে।

বাঙালি পাঠক বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশ্বসাহিত্যের প্রবেশদ্বার আরও কয়েকটি জাতির মতো প্রধানত ইংরেজি। ফরাসি, রুশ, জার্মান, ইস্পাহানী ভাষা কেউ কেউ জানলেও, তাঁদের সংখ্যা কোটিকে গোটিক। কিন্তু মধুসূদন বা হরিনাথ দে অথবা সুনীতিকুমারের মতো বহু ভাষাবিদ সব সমাজে সর্বকালেই বিরল। আর মধুসূদনের মতো বহুভাষাবিদ ও রসবেত্তা রসস্রষ্টা তো আরও বিরল। ফলে, ইংরেজি ভাষায় অন্য ভাষা থেকে দ্রুত অনুবাদের যে ধারা গড়ে উঠেছে, বাঙালি পাঠক বিশ্বসাহিত্য পাঠের মাধ্যম হিসাবে সে কারণে প্রধানত ইংরেজি ভাষাকেই অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তবু, বহু ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে বাঙালি অনুবাদক বহু বই বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এরকম ক্ষেত্রে পাঠক হিসেবে বিশেষ বইটি, কাব্যগ্রন্থটি অনুবাদকের ভালো লাগার কারণটিই প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। অধুনা হালকা রোমাঞ্চকর বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। বাঙলায় নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রেও অনুবাদের বড় ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু কবিতার যখন ভাষান্তরের চেষ্টা বাঙলায় করা হয়, তা একান্তই কাব্যপ্রেমীর ভালোবাসার তাগিদে। কেননা, কবিতার অনুবাদ বাঙলা ভাষায় অনেক দিন ধরে যদিও হচ্ছে, তা এখনও বাণিজ্যিক সাফল্যর চৌকাঠ পেরোতে পারে নি।

বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদের প্রথম সংগ্রহ ''হে বিদেশী ফুল''-এর প্রস্তাবনার প্রথম বাক্যেই অনুবাদকের সংশয় প্রকাশিত হয়েছে, ''এই অনুবাদগুলির সার্থকতা অনিশ্চিত হলেও এগুলি ছাপাবার জন্য উদ্যোগী প্রকাশকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।...যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে।''[১] কবিতার অনুবাদক হিসেবে বিষ্ণু দে-র প্রবণতা মূলের প্রতি নিষ্ঠায়, faithfulness-এ।

বিদেশী কবিতার অনুবাদ করে অনুবাদক মূল কবিতার কবির কাছে স্বীকৃতি, প্রশংসা পান না বললেই চলে। কেননা, ইউরোপীয় ভাষাগুলি থেকে অনূদিত কবিতার কবিরা অনুবাদের ভাষা জানেন না। এবং বহু ক্ষেত্রেই বাঙলায় অনুবাদ হয়েছে মূল ভাষার কবির মৃত্যুর পরে। যেমন শেকসপীয়র, ডান, ব্লেক প্রভৃতি অনেক কবির ক্ষেত্রে। সে কারণে অশ্রুকুমার সিকদার অনুবাদকের কাজকে একলব্যের সাধনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্য, অনুবাদক ও কবি — উভয়ে যেখানে পরস্পরের ভাষা বোঝেন, সেখানে পরিস্থিতিটি হয় অন্য ধরনের। এলিঅট ফরাসি ভাষাতেও কবিতা লিখেছেন। সাঁ ঝ পার্সের 'আনাবেসি' (Anabasis) কাব্যের অনুবাদ করেছেন

এলিঅট। সে কাব্যের অনুবাদে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম ভূমিকায় এলিঅট লিখেছিলেন, "As for the translation it would not be even so satisfactory as it is, if the author had not collaborated with me to such an extent as to be half-translator. He has, I can testify, a sensitive and intimate knowledge of the English language, as well as a mastery of his own." এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালে, তার উনিশ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এলিঅট জানিয়েছেন যে স্বকৃত ভুলত্রুটি তো সংশোধন করলেন, অধিকন্তু, "In this revision I have depended heavily upon the recommendations of the author, whose increasing mastery of English has enabled him to detect faults previously unobserved,...." এর ন-বছর (১৯৫৮) পরে তৃতীয় সংস্করণে মাত্র একটি বাক্যের টীকায় এলিঅট জানিয়েছেন, "The Alterations to the English text of this edition have been made by the author himself, and tend to make the translation more literal than in previous editions."[২] শেষ টীকায়, মনে হয়, প্রথম সংস্করণে অর্ধেক-অনুবাদক হিসেবে এলিঅটের যে দাবি, তৃতীয় সংস্করণে তার আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। শুধু তাই নয়, প্রতিটি সংস্করণে আমরা পেতে থাকি ভিন্ন এক কবিতা। এবং কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকলেও, পরবর্তী কালে ফেবার কোম্পানি এলিঅটের অন্যান্য বইগুলির মতো 'আনাবেসি'র নতুন মুদ্রণ প্রকাশ করে নি।

॥ দুই ॥

বিষ্ণু দের টি এস এলিঅটের অনুবাদের সূচনা প্রকৃতপক্ষে বাঙলায় গদ্যছন্দ প্রচলিত করার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কে ও ছলনায়। এলিঅটের 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই' কবিতার বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথকে গদ্যছন্দে পুনর্লিখনের জন্য বিষ্ণু দে পাঠিয়েছিলেন। সে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে পুনর্লিখিত হয়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে (মাঘ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। বিষ্ণু দে জানিয়েছেন যে 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু এলিঅটের এর অংগে লেখা ছোটো কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দেয় নি।[৩] তা হলে প্রশ্ন থেকে যায়, রবীন্দ্রনাথ মূল কবিতাটি থেকে 'তীর্থযাত্রী' সরাসরি অনুবাদ করলেন, না বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদের পুনর্লিখন করলেন? বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদের, পুনর্লিখন হলে, আমরা অনুবাদটি দ্বিতীয় হাত ঘুরে পাচ্ছি। কিন্তু 'পুনশ্চ' গ্রন্থের টীকায় 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি এলিঅটের কবিতাটির অনুবাদ বলা হয়েছে।[৪] ১৯৬৬ সালে, অন্যত্র বিষ্ণু দে-র লিখিত বক্তব্যে জানা যায়, "১৯৩০-৩১ নাগাদ এলিঅট সাহেবের 'এরিয়েল' কবিতাপুস্তিকা কলকাতায় পাওয়া গিয়েছিল। তার আট নম্বর হল 'জার্নি অব দি ম্যাজাই,' ষোল নম্বর হল 'সিমেঅনের' গান। তারপরে 'পরিচয়' পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেরলো, আধুনিক কাব্য বিষয়ে। সেই বিরোধী প্রবন্ধে তিনি এলিঅটের প্রথম দিককার কবিতা প্রয়োগ করেন। লেখক তখন ক্ষুব্ধ হয়ে আট নম্বর 'এরিয়েল' কবিতাটি যে অনুবাদ করেছিল সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠায়। সে সময়ে গদ্যছন্দ বিষয়ে তার জিজ্ঞাসা ছিল। তাই অনুরোধ করেছিল, কবিতাটি যদি তিনি তাঁর তৎকালীন গদ্যকবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে ঐ ছন্দের স্বরূপটা সে ধরতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে। আমার বন্ধু পরিচয়-সম্পাদক একদিন তাঁকে বলেন, আপনাকে এই সুযোগে অমুক এলিঅটের সাম্প্রতিক কবিতা পড়াল। তিনি বলেন, তাই বুঝি, এলিঅট তো ভালো লেখে, তার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, তুমি ঐ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছাপো। তারপরে তিনি ইংরেজি কবিতাটি এবং অনুবাদটি নিয়ে মিলিয়ে দেখেন এবং সেইটেই হল ১৩৩৯ সালের [? সনের] এলিঅট অনুবাদ। 'শিশুতীর্থ' তার আগের বছরের।"[৫]

এই বক্তব্যের দু-একটি উপসিদ্ধান্ত হল, এক: 'তীর্থযাত্রী', কবিতাটি বর্তমান রূপটি বিষ্ণু দে-কৃত 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই' কবিতাটির পুনর্লিখন। দুই: রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদটি পাবার আগেই এলিঅটের 'এরিয়েল' কবিতাগুচ্ছ হাতে পেয়েছিলেন। তিন: সেই গ্রন্থ থেকে একটি কবিতা (Preludes) পরিচয়ে প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' (১৯৩২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু তর্জমায়, কিছু মূল কবিতায় ব্যবহার করেছেন। চার: 'এরিয়েল' কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই' কবিতাটি যে মূলে এলিঅটের, তা ধরতে পারেন নি বা তার ঘনিষ্ঠ/সচিব—কেউ বলে দেয় নি।

রবীন্দ্রনাথ সরাসরি এলিঅটের 'প্রিলুডস'-এর যখন তর্জমা করেছেন, তা অত্যন্ত মূলানুগ;[৬] এবং সেই অনুবাদ 'তীর্থযাত্রীর' আগে।

কিন্তু 'তীর্থযাত্রী'র ভাষান্তরে রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের 'প্রিলুডস' অনুবাদের মূলানুগ রীতি রক্ষা করেন নি। বরং বিষ্ণু দে-র অনুবাদের ('রাজর্ষিদের যাত্রা') গদ্যগন্ধ যেন রবীন্দ্রনাথ মুছে দিতে চেয়েছেন। আমরা শেষ স্তবকটির উদাহরণ আলোচনা করতে পারি:

All this was a long time ago, I remember,
এসব ঘটেছে বহুকাল আগে, মনে পড়ে (*বিষ্ণু দে*)
মনে পড়ে এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে (*রবীন্দ্র*)
And I would do it again, but set down
This set down
This: were we led all that way for
Birth or death? There was a Birth certainly,
আবার ঘটুক এই চাই—কিন্তু লেখো
এই লিখে রাখো
এই: এতখানি পথ চালিত হলুম আমরা যে
সেকি জন্ম না মরণের তীর্থে? জন্ম হয়েছিল এক নিশ্চিত
ত,
(*বিষ্ণু দে*)
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো—
এই লিখে রাখো—এত দূরে যে আমাদের টেনে
নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর!
জন্ম একটা হয়েছিল বটে
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই। (*রবীন্দ্র*)
We had evidence and no doubt, I had seen
birth and death,
But had thought they were different, this
Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death,
Our death.
প্রমাণ পেয়েছি, নেই কোনোই সংশয়। আমি তো
দেখেছি দুইই জন্ম ও মরণ,
আমার ধারণা ছিল ও দুটি স্বতন্ত্র; এই জন্ম এল
আমাদের ক্ষুরধার কঠিন যন্ত্রণা, মরণের মতো, আমাদের
আপন মরণ
(*বিষ্ণু দে*)
এর আগে তো জন্ম দেখেছি, মৃত্যুও—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এক যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর
মতোই।
(*রবীন্দ্র*)

স্পষ্টতই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে এলিঅটের 'প্রিলুডস্' অনুবাদে যে মূলানুগ রীতি অনুসরণ করেছেন, 'তীর্থযাত্রী'তে সে-রীতি রক্ষিত হয় নি। 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই'-এর অনুবাদের চরণ বিন্যাসে, স্তবক নির্মাণে বিষ্ণু দে স্বয়ং এলিঅটের অনুসারী, রবীন্দ্রনাথ তা নন। স্পষ্টই মনে হয় বিষ্ণু দে মূল ইংরেজি কবিতা সামনে রেখে চরণ সাজাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথের সামনে যেন সেই মুহূর্তে মূল কবিতাটি অনুপস্থিত। এবং মেজাজের দিক থেকে "একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে 'তীর্থযাত্রী' সমসাময়িক রবীন্দ্রকাব্যধারার পরিচয়বাহী এবং রচনারীতিতে 'পুনশ্চ'র অন্যান্য কবিতার সমপর্যায়ভুক্ত।"[৭]

অনুবাদ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছিলেন, "অনুবাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের খ্যাতি বেশি, কিন্তু কবিতার অনুবাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় বিষ্ণু দে যে অনেক বেশি মূলানুগ, মূলের সঙ্গে তর্জমা মিলিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"[৮]

এই মন্তব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গত কয়েক দশকের নানা আলোচনায় আমাদের মধ্যে এরকম একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, বিষ্ণু দে-র সঙ্গে এলিঅটের একটা স্বভাবগত মিল আছে। খতিয়ে দেখা হয় নি যে, সে মিল স্বভাবগত, চিদাত্মার (Spirit), না প্রকরণগত, বহিরঙ্গের।

একটি কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত স্তরে বিষ্ণু দে-র একাধিক ইংরেজ বন্ধু থাকলেও, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এবং বাঙালির সঙ্গে ইংরেজের 'মৌল পার্থক্য' তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। 'এলিঅটের কবিতা' নামক অনূদিত কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'টমাস স্ট্যানস্ এলিঅট' নামে যে ভূমিকাটি ছিল, তার প্রথমেই বিষ্ণু দে লিখেছিলেন, "ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে মৌল প্রভেদ দুশোবছরের রাজদণ্ডের প্রতাপেও ঘোচেনি, সে দুস্তর ব্যবধানবশত সাহিত্যের গৌণ তথ্যের মাহাত্ম্য শুধু সাহিত্য-বিচারেই আবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এলিঅট তাই বলাই বাহুল্য মার্কসবাদের মতো সৌরবিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদিনী রাত বটে। মার্কসের পুঁথিপত্রে এল সারা য়ুরোপ, য়ুরোপের আন্দোলনে এল সারা দুনিয়াই

আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে, ভারতবর্ষই এল সেই নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। সেই ব্যাপ্ত বিশ্বের যোগাযোগে সাহিত্যের সব কুঠুরি খুলল, তার একটি হচ্ছে কাব্যচর্চার তীব্র শুদ্ধি ও বিজ্ঞানবদ্ধ বোঝার চেষ্টা। সে চেষ্টায় গত শতকের য়ুরোপের, বিশেষত ফ্রান্সের দান নগণ্য নয়।''[১] এই উপলব্ধিতে যদি অন্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন সেই সময় বা পরবর্তীকালে না-ও থাকে, এই উপলব্ধি একান্তভাবে বিষ্ণু দে-র। বিষ্ণু দে-র মানস-গঠনের উপাদানগুলির সূত্র কবি এখানেই রেখেছেন। তাই এই জটিল অনুচ্ছেদটিকে একটু সতর্কভাবে ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন :

১. ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ মৌল ;
২. তা দুশো বছরের রাজদণ্ডের প্রতাপেও ঘোচে নি ;
৩. সে কারণে সাহিত্যে গৌণ তথ্যের মাহাত্ম্য শুধু সাহিত্য বিচারেই আবদ্ধ, ইংলন্ডীয় বিষয়বস্তু আমাদের সাহিত্যে বিচার্য নয় ;
৪. মার্কসবাদ সৌরপরিবর্তনতুল্য,
৫. মার্কসবাদের পুঁথিপত্র সমগ্র ইউরোপ ও সারা দুনিয়াকে আমাদের মনোজগতে হাজির করল ;
৬. তার ফলে ভারতবর্ষ নিয়ে আত্মবীক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি হল ;
৭. তার ফলে সাহিত্যের নানা প্রকোষ্ঠ উন্মুক্ত হল ;
৮. এল কাব্যচর্চায় তীব্র শুদ্ধি চেতনা,
৯. এল বিজ্ঞান চেতনা,
১০. এর জন্যে শুধু ইংল্যান্ড নয়, ইউরোপ ও বিশেষত ফ্রান্সের দান নগণ্য নয় ;
১১. মার্কসের সৌরবিবর্তনের পাশে এলিঅট 'একটা চাঁদিনি রাত বটে'।

তাহলে, বিষ্ণু দে-র চেতনায় ইউরোপীয় ও বিশ্ব সংস্কৃতির সামগ্রিকতায়, ভারতীয় উত্তরাধিকার চেতনার সমগ্রতার পাশে, এলিঅটের অনস্বীকার্য উপস্থিতি 'একটা চাঁদিনী রাতের' মতো, যা মোহগ্রস্ত করলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সচেতন বোধের জগতে আন্তর-প্রভাবও রাখে না। কাব্যের জগতে এলিঅট যে টেকনিকের, প্রকৌশলের অভিনবত্ব এনে ইংরেজি কবিতা সহ নানা ভাষার কাব্যকে গতি দান করেছিলেন সে স্বীকৃতি না দিলে তথ্যের বাস্তবকে অস্বীকারের অসততায় পড়তে হয়। কিন্তু বিষ্ণু দে-র যখন কাব্যরচনার সূচনা পর্ব, তখনই এলিঅটের ক্যাথলিক, রাজতন্ত্রী, বিপ্লববিরোধী, ইউরোপকেন্দ্রিক লক্ষ্মণগুলি ফুটে উঠেছে।

এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়[১০] বিষ্ণু দে প্রভৃতি বাঙালি কবিরা এলিঅটকে পেয়েছিলেন। তাহলে এই অবসিতপ্রায় এলিঅটকে কিভাবে স্বীকরণ করলেন বিষ্ণু দে? আরাগঁর কাব্যতত্ত্ব, যা কার্যত বিষ্ণু দে গ্রহণ করেছিলেন স্বীয় কাব্য সৃজনে,—সে তত্ত্বের মূল কথা হল, ''কাব্যের ইতিহাস তার টেকনীকের ইতিহাস।''[১১] ''আরাগঁ বলেছেন কাব্যসাহিত্যে কোনো ডগমাই প্রযোজ্য নয়। এলিঅটের ডগমা অবশ্যই আমাদের পক্ষে অগ্রাহ্য।''[১২] ''ইংরেজি, য়ুরোপীয় এবং আমাদের নিজেদেরই সাহিত্যের ঐতিহ্য সন্ধানে তাই এলিঅটের নিদর্শন শ্রদ্ধেয়।''[১৩] এই শ্রদ্ধেয় নিদর্শন সামনে রেখেই 'এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতার' গোধূলি-পর্বে বিষ্ণু দে-র ''নেতির সংযমের শিক্ষা শুরু হল।''[১৪] তাই negation, নেতির মধ্যে দিয়ে ইতিবাচকতাকে নিজের কাব্যে বিষ্ণু দে প্রকাশের প্রয়াস পেলেন। তুলনাটি সমপর্যায়ের না হলেও, সরল করে বলা চলে মার্কস যেভাবে জানিয়েছিলেন হেগেলকে স্বীকৃতি, বিষ্ণু দে-র এলিঅট স্বীকৃতি অনুরূপ। এ-স্বীকৃতি গুরুশিষ্য ক্রম অনুলোম উত্তরাধিকার ভাবা ভুল। এলিঅট-নেতির পন্থায় বিষ্ণু দে-র আত্ম-আবিষ্কারে সহায়ক হয়েছেন।

আলোচ্য ভাবনার অনুক্রমে এসেছে এলিঅটের কবিতার অনুবাদ-সম্ভাব্যতা বিবেচনা। ''তাই এলিঅটের সব কবিতার অনুবাদ ঘটনে বাধা থাকলেও তাঁর রীতি আমাদের সহায়, এমন কি তাঁর কবিতার অলঙ্কার, অঙ্গবিন্যাস, জগৎ ভিন্ন হলেও। কাব্যের মুক্তির চেতনার ফল হয়েছে এই। প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই ''রাজর্ষিদের যাত্রা''র মতো ক্রিস্টিয়ান কবিতা গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়, ''কোরিওলান'' পায় ইনটেরিম সরকারের কালে, ''গেরোনশন'' হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতায় উদ্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।''[১৫]

বিষ্ণু দে-র ''এলিঅটের কবিতা''র, প্রথম প্রকাশিত সংস্করণে কবিতা ও কবিতাংশ ছিল মোট আঠারোটি।

পরবর্তীকালে তাঁর অনুবাদ-সমগ্র ''তুমি রবে কি বিদেশিনী'' গ্রন্থে কবিতা ও কবিতাংশের সংখ্যা আরও নয়টি বেড়েছে। এই সংযোজিত কবিতাগুলি—জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগান? বাঙলায় lovesong 'প্রেমগান' হবে, উল্লিখিত গ্রন্থে 'নামগান' ছাপায় ভুল। কেননা, বিষ্ণু দে-কৃত কবিতাটির অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় সেন্ট্রাল ক্যালক্যাটা কলেজ পত্রিকায় 'জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগান' নামে এবং একটি সংক্ষিপ্ত টীকা সহ মুদ্রিত হয়েছিল, যে টীকাটি 'তুমি কি রবে বিদেশিনী'তে নেই। টীকাটি—''এলিঅট সাহেবের কাব্যগ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে এই কবিতাটি দিয়ে, যদিও তারিখ হিসাবে এটি বোধ হয় ''এক মহিলার আলেখ্য''—কবিতাটির পরে, ১৯১১ সালে, প্যারিস মিউনিক ভ্রমণের সময়ে। কবিতা অনুবাদ স্বভাবতই কঠিন, এ ক্ষেত্রে সে কাঠিন্য কিছুমাত্র কমে নি, বিশেষ করে উল্লেখ উদ্ধৃতির কৌশল-ব্যবহারের কারণে। প্রথমেই, দান্তের ছ লাইন, মন্তেফেলত্রোর সামন্ত গ্যিদোর কথা। লাফর্গের লেজঁদ তারপরে পাঠকের মনে আসতে পারে, হালকাভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় হিসিঅড, ফোর্ড, শেকসপিঅর, টমাস মুর, বাইবল, মার্ভল, বেডোজ, মার্লো, টেনিসন, ডন, কীটস, আর্নল্ড, বদলেয়র প্রভৃতি কবিতার থেকে আভাস ইঙ্গিত। অনুবাদক : বিষ্ণু দে।''[১৭]

প্রুফ্রক বাদে 'হেলেন-মার্সি' (Aunt Helen); চড়কের গানের (Ash-Wednesday) দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অংশ, (প্রথম ও ষষ্ঠ অংশ প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত) 'এক বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য কয়ছত্র' (Lines for an Old Man); 'আফ্রিকায় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি কয়ছত্র' (To the Indians who died in Africa), 'আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ পত্র' (A Dedication to my Wife)—এই নয়টি কবিতা পরবর্তী সংযোজন।

তা হলে, বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদের দুটি পৃথক পর্ব আমরা লক্ষ করতে পারি, বা একই পর্বে দুই ভিন্ন মানসিকতাও ক্রিয়াশীল অনুবাদক বিষ্ণু দে-র মধ্যে। প্রতীকী রীতির, নিহিত স্বাধীনতার বশেই বাঙালি পাঠকের কাছে বিমূর্ত, পরোক্ষ এলিঅটী কবিতাগুলির কয়েকটিতে বিষ্ণু দে এনেছেন সাময়িক ভারতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ—এই কবিতাগুলি সম্পর্কে বিষ্ণু দে উক্ত প্রবন্ধে প্রসঙ্গও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, এই পর্বটি, বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদের প্রথম পর্ব।

এক : 'রাজর্ষিদের যাত্রা' গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়।'

দুই : 'কোরিওলানের' অনুবাদ অবলম্বন ইনটেরিম সরকারের কালে।'

তিন : 'গেরোনশন' হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতায় উদ্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।'

রাজনীতি-সচেতন এবং সমাজ-সচেতন হয়েও বিষ্ণু দে প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক কবি নন, নানা অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গে তাঁর সমগ্র কাব্যে দেশীয় ও বিশ্বরাজনীতির বহু উল্লেখ রয়েছে। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত বিষ্ণু দে-কে স্বভাবতই স্পর্শ করেছে। ১৯২৭-এ বিষ্ণু দে আঠারো বছরের যুবক, ১৯৪৬ সালে পৌঁছেছেন সাঁইত্রিশ বছরে।

১৯২৭-এর নভেম্বরে সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে প্রদেশগুলিতে জনপ্রতিনিধিত্বে মন্ত্রীসভাগুলি গঠিত হয়। এই সময়টিতে এক জটিল ও প্রায়শ পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকে। সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ কমিশানের প্রতিবাদে জাতীয় আন্দোলনে আইন অমান্য (First Civil Disobedience) শুরু হয়, ফলে গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে একটা প্রায়-সমতার অবস্থানে আসে।[১৮]

আবার, ১৯৩০-৩১-এ শুরু হয় দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience)-যা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গের জন্য ডাণ্ডি অভিযান। সে অভিযান সম্পর্কে গান্ধীকে আরউইনের উক্তি আমরা পরে জানতে পারছি, ''You Planned a fine strategy round the salt issue'' এমনকি শহরের মানুষ, যাঁরা গান্ধীর অনুগামী ছিলেন, তাঁরাও জনগণের দুর্দশা-নিপীড়নের সঙ্গে এক প্রতীকী একাত্মতার, সম্ভাবনা দেখলেন। ১৯৩১ সালের ১২-ই মার্চ থেকে ৬-ই এপ্রিল সবরমতী আশ্রম থেকে গান্ধীর ডাণ্ডি পর্যন্ত পদযাত্রা—গুজরাটের ভেতর দিয়ে একাত্তর জন আশ্রমসঙ্গীকে নিয়ে গান্ধী সমুদ্রের তীরে চলেছেন। তিনি নিজে আইন ভঙ্গ করেছেন ডাণ্ডিতে লবণ তৈরি করে। এর সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র, মদ্য ইত্যাদির অহিংস বর্জন চলতে থাকে। আন্দোলনকারীদের নিচুতলার চাপ সূচনার মুহূর্ত থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। গান্ধীর যাত্রাপথে গ্রামাঞ্চলের সরকারী কর্মীরা ইস্তফা দিতে থাকে। খাজনা বন্ধের জন্যেও গান্ধীর অনুমতি প্রার্থনা করে কোনো কোনো

স্থানে আন্দোলনকারীরা। মে মাসের মাঝামাঝি গান্ধী গ্রেফতার হন। কিন্তু শুরুতে কেউই বুঝতে পারে নি যে কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু পরিণামে এই আন্দোলন অত্যন্ত সফল বলেই মনে হয়েছিল।

উপরউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে মনে রেখেই বিষ্ণু দে 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই' অনুবাদ করেছেন। এলিঅটের এই কবিতার ওপর পার্সের 'আনাবেসি' কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এলিঅট পার্সের কবিতাটির অনুবাদের প্রথম খসড়াটি রচনা করেন ১৯২৭ সালে, এবং পার্সের "influence is seen in several of the poems that I wrote after having completed the translation: the influence of images and also perhaps of rhythm. Students of my later works will perhaps find that this influence always persisted." —বলেছেন এলিঅট।[১০]

খ্রিস্টিয় পুরাণে প্রথমে ম্যাজাইরা ছিলেন নবজাত যিশুকে পূর্বদেশ থেকে যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সম্মান জানাতে এসেছিলেন, পরবর্তী খ্রিস্টিয় ঐতিহ্য অনুসারে এই জ্ঞানীরা চাালডিয়া, নুবিয়া এবং ইথিওপিয়ার তিন রাজা। প্রাচীন পারস্যের যাদুকর-পুরোহিত শ্রেণীই 'ম্যাজাই' কিন্তু বিষ্ণু দে পরবর্তী খ্রিস্টিয় ঐতিহ্য অনুসারে এঁদের 'রাজা' এবং 'ঋষি' বলেই উল্লেখ করেছেন। তার ফলে বাঙালি পাঠকের অবচেতনে রাজর্ষি জনকের অনুষঙ্গ স্বভাবতই স্মৃতিকে উদ্‌বোধিত করে। গান্ধীর ডান্ডি অভিযানে বাষট্টি বছর বয়সে লাঠিহাতে এগিয়ে চলেছেন,—শিল্পী-ভাস্করদেরও কল্পনাকে গান্ধীর এই অভিযান উদ্রিক্ত করেছে। পরবর্তীকালে সে-চলাকে ভাস্করও (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী) মূর্তিতে ফুটিয়েছেন, কিন্তু চলার পথ শিল্পীর কল্পনায় পাথরের ওপর দিয়ে। অথচ, বাস্তবে গান্ধী হেঁটে গিয়েছিলেন সমভূমির ওপর দিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমির দিকে—এই প্রত্যক্ষ বাস্তব শিল্পীর চোখে অপ্রধান।

এলিঅটের 'জার্নি অফ দি ম্যাজাই' এর সঙ্গে গান্ধীর যাত্রার প্রেক্ষাপটের দুটি বড়ো স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়বে। সেখানে কনকনে ঠাণ্ডায় ম্যাজাইরা যাত্রা করেছিলেন, গান্ধীর ডান্ডি-অভিযান মার্চ এপ্রিলে। কিন্তু বিষ্ণু দে তাঁর 'রাজর্ষিদের যাত্রা'র মূল কবিতার শৈত্যের পরিমণ্ডলটি গ্রহণ করেছেন,—যাত্রার দুর্গমতা ও কাঠিন্যের দ্যোতনা অক্ষুণ্ন রাখতে।

এলিঅটের কবিতায় যাত্রার বিবৃতিদাতা একজন, The Magi; কিন্তু বিবৃতি বহুবচনাত্মক, We; বিষ্ণু দে-র রাজর্ষিদের যাত্রার সূচনা বহুবচনে:

A cold coming we had of it
আমাদের সে যাত্রা হিমে—

এবং এলিঅটের সমগ্র কবিতাটিই বহুবচনাত্মক একোক্তি (monologue)। প্রথম স্তবকটিতে বিষ্ণু দে-ও বহুবচন ব্যবহার করেছেন:

A hard time we had of it.
At the end we preferred to travel at night.
দুঃসময় গেল আমাদের।
শেষে তাই আমরা চললুম সারারাত না থেমেই,....।

কিন্তু দ্বিতীয় স্তবক থেকে বিষ্ণু দে বহুবচনাত্মক সর্বনাম ব্যবহার করেন নি:

Then at dawn we came down to a temperate valley.
তারপর ভোর বেলা এলুম কবোষ্ণ উপত্যকায়
Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel
তার পর পৌঁছলুম এক সরাইখানায়, চৌকাঠ আঙুরলতায় ঢাকা
But there was no information, and so we continued
কিন্তু সংবাদ মিলল না কিছু, আবার চললুম।

—এখানে একক যাত্রার অনুভব তীব্র হয়ে উঠেছে। আবার:—

This: were we led all that way for...
এই: এতখানি পথ চলিত চলুম আমরা যে
We had evidence and no doubt
প্রমাণ পেয়েছি, নেই কোনোই সংশয়
I had seen birth and death
আমি তো দেখেছি দুইই জন্ম ও মরণ
But had thought they were different
আমার ধারণা ছিল ও দুটি স্বতন্ত্র;

আবার একেবারে শেষ অংশে বিষ্ণু দে এলিঅটের মূলের বহুবচনে ফিরে গেছেন—

We returned to our places, these kingdoms.
আমরা এলুম ফিরে যে যার মুল্লুকে, যে যার রাজত্বে,

কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, গান্ধী যদিও একাত্তর জন শিষ্যসহ যাত্রা করেছিলেন, গান্ধীর যাত্রার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা একক যাত্রার—যদিও ক্ষুরধারের উপর দিয়ে কিনা সে ব্যঞ্জনা এখানে স্পষ্ট নয়। কিন্তু, সেই যাত্রার রাজনৈতিক সাফল্য কোনও স্বস্তি, চরম মীমাংসা নিয়ে আসে নি, ফলে

But no longer at ease here, in the old dispensation,
কিন্তু আর স্বস্তি নেই এখানে এ প্রাচীন বিধানে'

—এই ভাবনাই এলিঅটের ও বিষ্ণু দে-র তাই ভাষায় ও ভাষান্তরে তারতম্য ঘটে না। এবং মৃত্যুর সঙ্গে পুনরুত্থানের খ্রিস্টিয় মিথও জন্ম ও মৃত্যুর চক্রবৎ আবর্তনের ভারতীয় ধারণার সমান্তরাল অনুষঙ্গে তাই শেষ চরণটির প্রত্যক্ষ মূলানুসরণে বিষ্ণু দে-র অসুবিধে হয় না:

I should be glad of another death. খুশি হব আরেক মরণে।

প্রসঙ্গত, 'anabasis'এই গ্রীক শব্দের অর্থ 'a going up'পার্সের 'আনাবেসি', এলিঅটের 'জার্নি অব দি ম্যাজাই' রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' ও বিষ্ণু দে-র 'রাজর্ষিদের যাত্রা' এবং গান্ধীর ডান্ডি অভিযান—এই সব কিছুর মধ্যেই যাত্রার, a going up-এর ভাবটির সামান্যীকৃত উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে। চারটি কবিতায় এবং গান্ধীর অভিযানেও এক ক্রিয়ার চূড়ান্ত শিখরের উত্থানের (the rising of an action to its climax) রসব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়। কিন্তু বিষ্ণু দে-র মতো রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী'-তে গান্ধীর ডান্ডি অভিযান অনুবাদ-পট নয়।

এলিঅটের 'কোরিওলান' কবিতার পট শেকসপীয়রের কোরিওলেনাস নামে ঐতিহাসিক নাটক। কেইয়াস মারসিয়াস নামে এক অহংকারী সেনাপতি ভলস্‌সীয়দের (Volscians) বিরুদ্ধে আশ্চর্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং কোরিওলি (Corioli) নগর অধিকার করেন ও কোরিওলেনাস উপাধি লাভ করেন। যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁকে রাজদূতের পদ দিতে চাওয়া হয়, কিন্তু রোমক জনতার প্রতি তাঁর সোচ্চার ঘৃণায় অচিরেই তিনি জনপ্রিয়তা হারান। জনপ্রতিনিধি শাসকেরা তাঁকে সে কারণে বহিষ্কার করেন। কোরিওলেনাস ভলস্‌সীয় সেনাপতির গৃহে যান, সেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হন এবং প্রতিশোধের জন্যে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভলস্‌সীয়দের নেতৃত্ব দেন। রোমানরা কোরিওলেনাসের কাছে কয়েকজন দূত পাঠান, যাঁরা তাঁর পুরনো বন্ধু। কিন্তু কোরিওলেনাস সমস্ত শর্ত অগ্রাহ্য করেন। শেষ পর্যন্ত কোরিওলেনাসের মাতা, পত্নী, পুত্র রোমকে ধ্বংস না করার জন্যে মিনতি করে। তিনি সে মিনতি রক্ষায় রাজি হন এবং ভলস্‌সীয়দের অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন করে এনটিয়াম নামে ভলস্‌সীয় নগরে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে ভলসসীয় সেনাপতি ভলসসীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে কোরিওলেনাসকে অভিযুক্ত করে এবং স্বীয় উপদলের সহায়তায় কোরিওলেনাসকে হত্যা করে। শেকসপীয়ার এই কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন প্লুটার্কের থেকে। কোরিওলান এলিঅটের অসমাপ্ত কবিতা—পরিকল্পিত দীর্ঘ কবিতার মাত্র দুটি অংশ তিনি লিখেছিলেন। প্রথম অংশ Triumphal March, এখানে তিনি আধুনিক সমর আয়োজনের ভয়াবহতা ও অপব্যয়কে প্লুটার্ক ও শেকসপীয়রের কাহিনীকে পশ্চাদপটে রেখে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিষ্ণু দে এই অংশটির অনুবাদে কিছু ভারতীয় চিত্রকল্প সংযোজন করেছেন, যেমন 'And so many eagles.' 'আর কত কপিধ্বজ'; 'And Easter day' । 'মহাষ্টমীর দিন'; 'So we took young Cyril to Church. And they rang a bell/And he said right out aloud, crumpels'/'তাই তো গেলুম সব ছোকরা শিবুকে নিয়ে বারোয়ারিতলা। বাজল কাঁসর ঘণ্টা/এবং সরবে শিবু বলে উঠল, বাতাসা।' অথবা, Don't throw away that sausage,/It'll come handy'/'ফুলুরিটা ফেলো না হে, কাজে লেগে যাবে।' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশ Difficulties of a Statesman —বিষ্ণু দে করেছেন 'কর্ণের খেদ'। কোরিওলেনাসের রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ও রোমের প্রতি অভিমান ও ক্ষোভকে বিষ্ণু দে কর্ণের পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্ক ও অভিমান ক্ষোভের সঙ্গে সাদৃশ্যে দেখেছেন। কর্ণ কৃষ্ণ ও কুন্তির আহ্বানে পাণ্ডবপক্ষে না গেলেও পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জানার পরে কর্ণের মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যদিও দুর্যোধন কর্ণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনে নি। কোরিওলেনাসের, বিরুদ্ধে এসেছিল বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ।

বিষ্ণু দে জানিয়েছেন, 'কোরিওলানের' অনুবাদ অবলম্বন ইনটেরিম সরকারের কালে।'—ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে এ-দেশীয় নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ১৯৪৬ সালের ১২ই জুলাই ভাইসরয় অন্তর্বর্তী সরকার গড়ার জন্যে জওহরলালকে আহ্বান করেন। ওই বছর ১৭ই অক্টোবর কংগ্রেস মুসলিম লিগের

সহযোগিতায় অন্তর্বর্তী বা ইনটেরিম সরকার গঠন করতে চায়। কিন্তু প্রথমে মুসলিম লিগ ইনটেরিম সরকারে যোগদান করে নি। কলকাতা ও দেশের নানা অঞ্চলে তার আগেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ঘটে গেছে। অনেক টালবাহানার পরে মুসলিম লিগ ইনটেরিম সরকারে এবং উক্ত সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে বলে ওই বছরে ১৫ই অক্টোবর জানায়। ২৫শে অক্টোবর ইনটেরিম সরকারের মুসলিম লিগ সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়। ফলে ইতিমধ্যে গঠিত মন্ত্রীসভার পুনর্বিন্যাস করে মুসলিম লিগ সদস্যদের স্থান করে দেবার জন্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র ভগ্নিপতি), শারাফত আহমেদ খান এবং সৈয়দ আলি জাহিরকে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়। মুসলিম লিগের প্রধান হিসাবে লিয়াকৎ আলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর দেবার দাবি ওঠে। বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্র দফতর নিজের দৃঢ় হাতে রাখতে চাওয়ায় কংগ্রেস অর্থদপ্তরটি মুসলিম লিগকে দিতে চায়। তখন অর্থ দফতরের কর্মী চৌধুরী মহম্মদ আলি লিগকে বোঝান যে এ-এক বিরাট সুযোগ—অর্থ দফতরের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে ইনটেরিম সরকারের প্রতিটি দফতরের ওপরেই লিগের নিয়ন্ত্রণ বর্তাবে। এর ফলে ইনটেরিম সরকারের মাধ্যমে দেশ শাসনের কংগ্রেসের সমস্ত প্রয়াস অর্থ দফতরের প্রতিবন্ধকতায় ব্যর্থ হতে থাকে। 'কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে এক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে ইনটেরিম সরকারের জন্ম'। এবং দেশবিভাগের পরিস্থিতি,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস, সাধারণ মানুষের হতাশা, মন্ত্রীসভার অকর্মণ্যতা ইনটেরিম সরকারের আমলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২০] এই পরিপ্রেক্ষিতেই কোরিওলান কবিতার দ্বিতীয়াংশের অনুবাদ অলিঅটের চরণগুলি অর্থবহ করে তোলেন বিষ্ণু দে—

> We demand a committee,
> a representative
> Committee, a Committee of investiga-
> tion
> RESIGN RESIGN RESIGN
> আমরা সমিতি চাই, প্রতিনিধিমূলক সমিতি, তদন্ত
> সমিতি
> পদত্যাগ পদত্যাগ পদত্যাগ (*বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ*)

প্রকৃতপক্ষে, সেই কালের রাজনীতি সচেতন, এদেশীয় মানুষদের দাবিও বিষ্ণু দে-র এই এলিঅট অনুবাদের অবলম্বন প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, এই অনুবাদে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কাল এলিঅট অবলম্বনে ভাষা পেয়েছে। নামের সাজুয্য সত্ত্বেও এই কবিতা স্বতন্ত্র কবিতা, বিষ্ণু দে-র কবিতা; ভারতীয় সমস্যার কবিতা হয়ে ওঠে।

'গেরোনশন (Gerontion) অনুবাদে 'এলিঅটের কবিতা'র প্রথম সংস্করণে শেকসপীয়ারের 'Measure for Measure' থেকে উদ্ধৃত অংশটুকু অনূদিত ছিল না। এবং বিষ্ণু দে 'গেরোনশন'কে 'জরায়ণ' করেছেন।—যদিও মূল গ্রিক শব্দের ইংরেজি অর্থ 'little old man' 'জরায়ণে'র থেকে গান্ধী-রূপকল্পের কাছাকাছি।

বিষ্ণু দে জানিয়েছিলেন,' ''গেরোনশন্'' হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতায় উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।'

১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় একটি ছেলেকে বাঁচাতে চেয়ে বিষ্ণু দে-ও আহত হয়েছিলেন।[২১] সে দাঙ্গার অমানবিক পৈশাচিকতার পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল মানবিক শুভবোধের পরিচয়।[২২] কলকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। দাঙ্গা কেউ রোধ করতে পারে নি। দাঙ্গা প্রতিরোধের পূর্ব-প্রস্তুতিও ছিল না। 'কলকাতায় উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করেছেন' পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশভাগের মুহূর্তে। বিষ্ণু দে-র উক্তিতে আপাত-অসঙ্গতি রয়েছে—মনে হতে পারে, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা ঠেকাতে গান্ধী কলকাতায় অভিযান করেছিলেন। 'জরায়ণে'র অনুবাদ জুড়ে রয়েছে ১৯৪৬ আগস্ট থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এক বছরের কালপর্ব; গান্ধী বেলেঘাটায় হায়দরি ম্যানসানের অপরিষ্কার নোংরা দুর্গন্ধের পরিবেশে ১৯৪৭ সালের ১২ই আগস্টে ছাউনী ফেলেন। তখন বেলেঘাটা ছিল মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল, সে অঞ্চলের চারপাশে হিন্দু বস্তি। বেলেঘাটার সেই পরিবেশ 'জরায়ণে' চিত্রিত—''জোটে/মিস্টার তরফদার বেলেঘাটার হলের চৌকাঠে,'' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি ১৯৪৭ সালের ১২-১৬ আগস্টের বেলেঘাটার ঘটনাবলীর প্রমাণ।

''১৯৪৬ এর ২৯শে অক্টোবর নোয়াখালির পথে গান্ধীজী কলকাতায় আসেন। ৭ই নভেমবর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে চাঁদপুরে পৌঁছন। ৩০শে অক্টোবর থেকে ৫ই নভেমবর পর্যন্ত সোদপুরে প্রত্যহ তিনি প্রার্থনাসভা করতেন।''[২৩]

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের দিনটি এবং আগে-পরে কয়েকদিন গান্ধী কলকাতায় থাকায় ১৫ই আগস্টের 'স্বাধীনতা দিবসে' পাঞ্জাবের মতো কলকাতা তথা বাঙলায় দাঙ্গা হতে পারে নি। গান্ধী সুরাবর্দিকে নিয়ে শান্তি মিছিল করেছেন, যাতে অগণিত শুভবোধ সম্পন্ন মানুষ যোগ দিয়ে শান্তি কায়েম রাখতে সফল হয়েছিলেন। দেশ বিভাগের ফলে দাঙ্গা রোখার জন্য সৃষ্ট সীমানা-বাহিনী (Boundary force) পাঞ্জাবে দাঙ্গা রুখতে নানা কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু গান্ধীর অনুপ্রেরণায় কলকাতায় সেই 'সীমানা বাহিনী' কাজে লাগে নি। গান্ধী একাই পরবর্তী কালে 'One-Man Boundary force' বলে অভিহিত হন।[২৪] ১৯৪৬-৪৭ সাল জুড়ে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা রোধে গান্ধীর যথার্থ মূল্যায়ন অনেক গ্রন্থে করা হয় নি।[২৫]

১৯৪৬-৪৭-এর কলকাতার সেই দিশাহারা অবস্থার মধ্যে একাধিকবার গান্ধীর উপস্থিতি বিষ্ণু দে-র কাছে এলিঅটের 'Came Christ the tiger' রূপান্তরিত হয়,'এল কৃষ্ণ নরসিংহ/পাঞ্চজন্যে কেশরী হুংকারে, বংশীরবে'। আবার, গান্ধীর চারপাশে ভারতীয় ব্যবসায়ী দের ভীড় করে থাকা— সে বাস্তবও চিত্রিত হয়:

> গোপন ফিসফাসে, তাই জোটে হাতিলাল মেহতা
> কোমল পেলব হাতে, আহমেদাবাদে যেবা
> পায়চারি করেছিল সারারাত পাশের কামরায়

অথচ এই চিত্রণ একই সঙ্গে এলিঅটের

> Among Whispers; by Mr. Silvero With
> caressing hands, at Limagoes
> Who walked all night in the next room;

ইত্যাদি অংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদও বটে। কিন্তু কাল ও স্থান সচেতনতায় এলিঅটের কবিতার 'In depraved May' হয়ে যায় (১৯৪৬ সালের ১৬-২০ আগস্টের দাঙ্গার কালে) 'পচা ভাদ্র' আর 'Tenants of the house-,/Thoughts of a dry brain in a dry season'এর রূপান্তর ঘটে ''ঘরে ঘরে ভাড়াটেরা,/এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায় চিন্তারা/আমারও হৃদয়।'' এবং প্রাক্-সাতচল্লিশ স্বাধীনতার আশা ও দাঙ্গার হতাশায় এলিঅটের কাব্য পঙ্‌ক্তি:

> After such Knowledge, what forgive-
> ness ? Think now
> History has many cunning passages,co-
> ntrived corridors
> And issues, decieves with whispering
> ambitions,
> Guides us by vanity.

—ইত্যাদি পংক্তি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতেই যেন অনুবাদের মূলানুগ অথচ স্বচ্ছন্দ ভাষা পায়,

> এ প্রজ্ঞার পরে কিবা ক্ষমা ? ভাবো আজ
> ইতিহাসে আছে কত চতুর দালান, কত সুড়ঙ্গ নিপুণ
> কত নিষ্কাশন; ইতিহাস প্রবঞ্চক উচ্চাশার চক্রান্ত
> গুঞ্জনে
> দম্ভের ছলায় করে নিয়ন্ত্রণ আমাদের।

এই-সময় সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের চাপে জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র মতো দুই ভিন্ন কবির কাব্য-ভাবনায়, এক বিশেষ মুহূর্তে ঐক্য এসে যায় — জীবনানন্দ তাঁর '১৯৪৬-৪৭'. নামে বিখ্যাত কবিতায় লেখেন :

> যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
> বলে যাবে কাছে এসে, ইয়াসিন আমি,
> হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
> আর তুমি ?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ
> থেকে
> চোখ তুলে সুধাবে সে—রক্ত নদী উদ্বেলিত হয়ে
> বলে যাবে, 'গগন, বিপিন শশী পাথুরেঘাটার
> মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফস্ট্রিটের
> এন্টালীর—'
> কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
> মানুষ তো এরা সব ;........''

এবং বিষ্ণু দে লেখেন :

> কলকাতার নিরানন্দ খালে বিলে সেঁচা
> বিলীন হাওয়ায় যত অসুস্থ আত্মার
> আকণ্ঠ উদগার, যত ভারাক্রান্ত জড়
> জড়ো হয় বাতাসের লগির ঠেলায়
> বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ বেহালা মানিকতলা
> কাশীপুর, বরানগরের জোলো অন্ধকারে। এখানে সে
> নয়
> নয় সে এখানে এই অন্ধকার কিচিমিচি এ জগতে নয়।

—বিষ্ণু দে-র এই কবিতার শীর্ষে 'বরন্‌ট্‌ নরট্‌ন্' নামাঙ্কিত থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না,অনুবাদের আধারে বিষ্ণু দে রাজনৈতিক কবিতার পরিবর্তে কবিতার রাজনীতিতে এক ভিন্ন মাত্রা এনেছেন। সেই ভিন্ন মাত্রা বিষ্ণু দে-র অনুবাদেও সমকালের হতাশা, যন্ত্রণা, দিশাহারা

মানসিকতাকে প্রকাশে ব্যাকুল। হয়তো কমিউনিস্টদের ও মার্কসবাদের সঙ্গে নৈকট্য বিষ্ণু দে-র স্বরচিত কবিতায় হতাশা প্রকাশে বাধার কারণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তী কালে যে সামান্য কটি এলিঅটের কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, সেগুলি নিতান্তই মূলানুগ। এবং এলিঅটের মূল্যায়নে বিষ্ণু দে বহু কাল থেকেই অত্যন্ত সচেতন,—"প্রুফ্রকের আত্মসচেতন নিষ্ক্রিয় কৈশোর থেকে এ কবি পরিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থানে নমস্য কীর্তি তার করুণ রাজনীতি সত্ত্বেও।"[২৬]

'এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়' বিষ্ণু দে-র কাব্য-সাধনার সজ্ঞান প্রয়াস, ফলে এলিঅট সম্পর্কে শিষ্যের মোহ বিষ্ণু দে-র চেতনায় ছিল না। রাজনীতি, মতাদর্শগত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য ভাবনার ভিন্নতা সত্ত্বেও কাব্যের টেকনিকের ইতিহাসে এলিঅটের যে সংযোজন, সেই সংযোজনের জন্যেই মূলত বিষ্ণু দে-র কাছে এলিঅট মূল্যবান, 'নমস্য'।

সূত্র নির্দেশ

১. বিষ্ণু দে: হে বিদেশী ফুল, বাক্, ১৯৫৬
২. Eliot, T.S. *translation: Anabasis*, P 9-15, Faber and Faber, 1959.
৩. Dey Bishnu: *In the Sun and in the Rain, Homage to T.S.Eloit*, (1966), P-177-178, P.P.H. 1972.
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *পুনশ্চ*, পৃ: ২১১, বিশ্বভারতী, ১৯৮০.
৫. বিষ্ণু দে: *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা*, পৃ: ২৮-২৯, কলকাতা, ১৯৮৭।
৬. রবীন্দ্রনাথ: *আধুনিক কাব্য*, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭, রচনাবলী, পঃবঃ সরকার শতবার্ষিক সংস্করণ।
৭. বিনয় কুমার মাহাতা: *এলিঅট বিষ্ণু দে ও আধুনিক বাংলা কবিতা*, পৃ: ৫১, কলকাতা, ১৯৮৮।
৮. অশ্রুকুমার সিকদার: *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*, পৃ: ৪৯, ১৯৭৪।
৯. বিষ্ণু দে অনূদিত *এলিঅটের কবিতা* প্রথম সংস্করণ, সিগনেট, পৃ ৯ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে ৭ই এপ্রিল ১৯৮৩ তে প্রকাশিত *প্রসঙ্গ: বিষ্ণু দে* নামক মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জিটিতে *'এলিঅটের কবিতা'* গ্রন্থের পরিচয়ে কিছু ত্রুটি আছে, (১) পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০। (২) 'কবিতাগুলির নাম' তালিকায় 'টমাস স্টার্নস এলিঅট' প্রথম কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করে আঠারোটি কবিতার অনুবাদের হিসাব মেলনো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'দীর্ঘ ভূমিকাটি'র নাম 'টমাস স্টার্নস এলিঅট'। এর পরে (১) য়ো দোশিজা যো রোঙ্গ (২) জরায়ণ, কিন্তু সূচনায় শেকসপীয়ারের মেজার ফর মেজার থেকে উদ্ধৃতিটির অনুবাদ প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত ছিল না। (৩) ফাঁপা মানুষ, (৪) লাফিয়ে উঠল হাওয়া, (৫) জীবকণা, (৬) রাজর্ষিদের যাত্রা, (৭) সিমেঅনের গান, (৮) মারিনা, (৯) চড়কের গান-১, (১০) চড়কের গান-৬, (১১) কোরিওলান-১, (১২) কোরিওলান-২, নিসর্গদৃশ্য (১৩) নিউহ্যাম্পশিয়র, (১৪) ভার্জিনিয়া/লাল নদী—সূচীপত্রে মুদ্রিত ছিল না, কিন্তু মূল গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত (১৫) অসক্, (১৬) র‍্যানথ্ বাই য়েনকো, (১৭) কেপ অ্যান, (১৮) বরনট্ নরটন্। দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতা সংখ্যা-২২। ভূমিকাটি বর্জিত। তৃতীয় সংস্করণে কবিতা সংখ্যা-২৩। ভূমিকাটি বর্জিত।
১০. ঐ, পৃ: ৯।
১১. ঐ, পৃ: ১৩।
১২. ঐ, পৃ:১৪।
১৩. ঐ, পৃ:১৪।
১৪. ঐ, পৃ:১০।
১৫. ঐ, পৃ:১৫।
১৬. বিষ্ণু দে: *তুমি কি রবে বিদেশিনী*, পৃ:১১২-১৪৮, নাভানা, ১৯৮৬।
১৭. সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ পত্রিকা, ১৯৬০।
১৮. Spencer, J.B.Ed. *Shakespeare's Plutarch*, p-296-362, Orient Longman, India, 1975.
১৯. Azad, Maulana Abul Kalam, *India Wins Freedom*, P-159-180, Orient Longman, 1960
২০. Balabushevich and Dyakov Ed: *A Contemporary— Histrory— of— India*, P-424, PPH, 1964.
২১. প্রণতি দে: *জীবনই কবিতা—কবিতাই জীবন*, বিষ্ণু দে সংখ্যা, এবং এই সময়, অকটোবর-ফেবরুয়ারি, ১৯৯০.
২২. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়: *ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা*, উৎস মানুষ প্রকাশন। Mosley, Leonard, *The last Days of British Raj* 31-37, Jaico Books, 1961.
২৩. অশোক মিত্র: চতুরঙ্গ, পৃ: ৮৫৯, ফেবরুয়ারি, ১৯৯০।
২৪. Mosley, Leonard, *The last Days of British Raj*, P 250-265.
২৫. যেমন, আবুল হাশিম লিখেছেন, "কলকাতা এবং বিহারে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই ছিলো মুসলমান। গান্ধী কলকাতা বা পাটনা কোথাও সফর করেন নি" (পৃ:১০৮)— *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি* চিরায়ত, ১৯৮৮,
অশোক মিত্র, চতুরঙ্গ, ফেবরুয়ারি, ১৯৯০ সংখ্যার ৮৫৯ পৃ: দ্রষ্টব্য
২৬. বিষ্ণু দে: *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*, পৃ: ১২৬, সিগনেট, ১৯৫২।

কবি বিষ্ণু দে-র জন্ম ১৮ই জুলাই, ১৯০৯ এবং মৃত্যু ১৯৮২। আলোচ্য রচনাটি তাঁর এবারের জন্মবার্ষিকী স্মরণে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

লেখক পরিচিতি

সুজিত ঘোষ বর্তমানে চন্দননগর সরকারী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের রিডার এবং বিভাগীয়-প্রধান। তাঁর অন্যতম সম্পাদিত গ্রন্থ, *স্মৃতি ও সত্তায় বিষ্ণু দে*।

জাত বৈষ্ণব কথা

অজিত দাস

মাথায় টিকি নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, হাতে জপমালা মুখে কৃষ্ণনাম। এইতো বৈষ্ণব।
আমার যে ওসব কোন চিহ্নই নেই। তবু আমি বৈষ্ণব ?
ভগ্নীপতি মহাশয়মশায় বললেন, তা বৈষ্ণব বৈকী। পুরুষানুক্রমিক। পূর্বপুরুষ আগের সমাজ
ছেড়ে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিল। তারপর থেকে
যে এই বংশে জন্মাবে সে-ই বৈষ্ণব। জন্মসূত্রে ? তাইতো। সমাজের
সবাই তো সে ভাবেই পরিচিত। পৃথিবীর সব মানুষই।
অতএব আমি বৈষ্ণব

বাবাকে এক সময়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের এই পরিবারের আদি পুরুষ কে? কতো পুরুষ আগে তিনি ?

বাবা বলেছিলেন, আমাকে নিয়ে সাত পুরুষের কথা বলতে পারি। সম্ভবত ঊর্ধ্বতম এই সপ্তম পুরুষই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

তাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচয় কী ছিল ?

তা তো বলতে পারব না। কথায় বলে জাত হারিয়ে বোষ্টম। একথার অর্থ অবশ্য ভিন্ন। কদর্থক। আমরা বলব, জাত ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ণব হয়েছি। ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হলে তার পূর্ব পরিচয় নামধাম, কুল মান, গোত্র সব ছেড়ে দিতে হয়। পূর্ব পরিচয় মুছে দিতে হয় একেবারে। সে পদবি এবং নামও আর থাকে না। নতুন নামকরণ হয়। নতুন পদবি হয়। পূর্বাশ্রম কথা বলা নিষেধ। সে বৈষ্ণব এই মাত্র পরিচয়। মহাপ্রভু বলতেন, মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই। অর্থাৎ বৈষ্ণব একজাতি। বৈষ্ণবের জাতি বিচার নেই। ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ লুপ্ত। নানা বর্ণের মানুষ ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছে। তখন দেশে চৈতন্য প্রেমের জোয়ার নেমেছিল। শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়। সারা বাঙলাই ভেসে গিয়েছিল। আকাশে বাতাসে শুধু কীর্তনের সুর — নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। সেই ঢেউ-এর প্রভাবেই আজ আমরা বৈষ্ণব পরিবার।

আমাদের সেই আদিপুরুষ ভগবৎ প্রেমে মত্ত হয়ে বৈষ্ণব হয়েছিলেন না অন্য কোনো সামাজিক কারণ ছিল ?

তা তো বলা যাবে না। পূর্বাশ্রমের পরিচয়ই যে অজানা। সামাজিক কারণেও হতে পারে।

তাঁর বৃত্তি কি ছিল ?

মনে হয়, কৃষিজীবী। সঠিক বলা কঠিন। তবে বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল। পারিবারিক হালচাল দেখে তাই অনুমিত হয়।

কোন বর্ণের মানুষ ছিলেন বলে মনে হয় ?

সে তো ছ-পুরুষ আগের কথা। আমরা এখন চাকরীজীবী সমাজভুক্ত মানুষ। আদি পুরুষ মধ্যম বর্ণ হতে পারে, নিম্নবর্ণও হতে পারে।

মধ্যম বর্ণ কী ?

নবশাক সমাজ। আবার নেড়ানেড়ীও হতে পারে।

সেটা কী ?

বৌদ্ধ।

আমরা বৌদ্ধ ছিলাম ?

হতে পারে। বৌদ্ধ থেকে বৈষ্ণব হয়েছি।

উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলাম না ?

মনে হয় না। তাহলে একটা খানদানী ভাব থাকত। পূর্বাশ্রম কথা জাহির করত। তাকে ত্যাগ করলেও। তাছাড়া উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে মিশতে যাবে কেন ? হাতে পাওয়া বিশেষ সুযোগসুবিধা কেউ কি ছাড়তে চায় ? তারা বৈষ্ণব হলে গুরুগিরি করবে। গোঁসাই হবে। আরও উঁচুতে উঠতে চাইবে। জাত বৈষ্ণবের খাতায় নাম লেখাবে কেন ?

নিম্নবর্ণ থেকে বৈষ্ণব হলে গোঁসাই মহান্ত হতে পারে না ? উচ্চ বর্ণের হলে পাকা ব্যবস্থা। নিম্নবর্ণের হলে নরক ঘাঁটা। মহান্ত হলে হবে ছোটোলোকের মহান্ত। ওপরতলাতে মান পাবে না। তবে আমার দিদিমার বাবা ছিল বামুন। চট্টোপাধ্যায় পদবি ছিল। তা থেকে মহান্ত হয়েছিল।

বামুন ছিল ?

হ্যাঁ। বামুন থেকে বৈষ্ণব।

কেন ?

তা জানি নে। কবিরাজী করত। সেজন্য দিদিমা কবিরাজী চিকিৎসা জানত।

বৈষ্ণব হয়ে লাভ কী হয়েছে বাবা ?

যিনি হয়েছিলেন, তিনিই এর উত্তর দিতে পারতেন। তবে আমরা শ্রীচৈতন্যর মতো একজন মহাপুরুষের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েছি। অতঃপর বাবা আবৃত্তি করতেন :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরি ॥

বাবা বলতেন, এইখানে একটা কথা বলা দরকার।

এখন যুগ পরিবর্তিত। সদা হরিনাম কীর্তন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। বিকল্প হিসাবে কীর্তন করতে হবে। সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা আর মানবিকতার। এছাড়া বৈষ্ণব হয়ে আরেকটা লাভ হয়েছে। বামুন পুরুতের হাত থেকে বেঁচেছি। চারদিকে দেখ তো কি রকম সব কাণ্ড করে। পুজোপার্বণ বিয়ে শ্রাদ্ধতে লোকে ভয়ে মরে পুরুতের দাপটে। আমাদের ওপর ওদের কর্তৃত্ব নেই। ওদের শাস্ত্র আর আচারের অধীন নই আমরা। আমাদের পুজো আমরাই করি। তোমার ঠাকমাই করে। পুরুত লাগে না। আমাদের নীতি হচ্ছে :

না করিবে অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।
না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥

আমাদের অতো দেবদেবীও নেই। রাধাকৃষ্ণ আর নিতাই গৌর — ব্যস। বামুন পুরুত সর্বনাশা। ওদের মন্ত্রই হচ্ছে ব্রাহ্মণায় দদ। শুধু দাও আর দাও।

গলায় কণ্ঠী, নাকে রসকলি হাতে জপমালা — ঠাকমা। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম মুখস্থ। কখনও কণ্ঠে কীর্তনের সুর। ঠাকুর দেবতার পুজো তিনিই করতেন। জন্মাষ্টমী আর দোল পূর্ণিমায় বাড়িতে জাঁকিয়ে পুজো হত। জন্মাষ্টমীর দিন পিতলের গামলা ভরা তালের বড়া নিয়ে ঠাকমা পুজোয় বসতেন। আমরা নেচে নেচে গাইতাম — তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচেরে। ঠাকমা পুজো করতেন। পুরুত — মেয়ে পুরুত।

বাবা, মেয়ে পুরুত হয় ?

আমাদের ঘরে হয়। এটা মহাপ্রভুর কৃপা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আইন করে দিয়েছিলেন যে শূদ্র আর স্ত্রীজাতির বেদ পাঠ, শাস্ত্র চর্চা আর পূজার্চনার অধিকার নেই। তাদের পক্ষে এসব কর্ম নিষিদ্ধ। বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজে স্মার্ত পণ্ডিতদের ঘোষিত নীতি আজও মান্য হয়ে আছে। কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যর একদিন আলোচনা হল :

ঘরে ঘরে করিমু : কীর্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥
অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥
অদ্বৈতর বাক্য শুনি করিলা হুংকার।
প্রভু বোলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥

মহাপ্রভুর এই কৃপাতেই বৈষ্ণব সমাজে মেয়েদের মান বেড়ে গেল। নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী জাহ্নবা দেবী, অদ্বৈত প্রভুর স্ত্রী সীতা দেবী — বৈষ্ণব গুরু হয়ে গেলেন। বৈষ্ণব আন্দোলনের নেত্রী হলেন তাঁরা। পুজোপাঠের, শাস্ত্র চর্চার অধিকার পেয়ে গেলেন। বৈষ্ণব সমাজের মেয়েরা বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্র চর্চা — সব কিছুই করতে লাগলেন। তাই তোমার ঠাকমা পুজো করে। মেয়ে পুরুত।

বাবা মুখে যাই বলুন। মনে তাঁর দ্বিধা ছিল।

গ্রামে একটা আখড়া ছিল। সেই আখড়ার অধীন ছিল গ্রামের সব বৈষ্ণব পরিবার। আখড়ার মহান্ত বাবাজীই ছিলেন সমাজের পুরোহিত। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া সব কাজই সমাধা করতেন তিনি। হঠাৎ কি হল বাবা আখড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। একা নন। যে কটি শিক্ষিত পরিবার ছিল সকলে এক যোগে পরিত্যাগ করলেন আখড়াকে। সব কজনই শিক্ষিত এবং সমাজে প্রভাবশালী। ফলে রাধাগোবিন্দ মহান্ত বাবাজী নীরবতা পালন করলেন।

বাবা তখন বলতে লাগলেন, মহান্ত কিছু জানে নাকি ? ও তো মূর্খ। আখড়ায় যারা জোটে সব ছোটোলোক আর মূর্খ। তাদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে। পঙ্কজ ঠিক কথাই

বলেছিল।

সে আরেক কাহিনী।

বাবা কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন শহরে। সেখানে উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট পরিবারের একটি যুবক নবদ্বীপের বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক রামদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। নাকে রসকলি, মাথায় টিকি, গলায় কণ্ঠি, হাতে জপমালা, পরনে ধুতি, গায়ে উড়ুনী — এই বেশে তিনি শহরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন বাবার সহপাঠী কলেজের কিছু ছাত্র, যুক্তি করে বিকালবেলা পথের ওপর জনসমক্ষে সেই নবীন বৈষ্ণবকে ঘিরে ধরে হেনস্থা করে তাঁর নাকের রসকলি জিব দিয়ে চেটে তুলে দিলেন আর কী ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

সেই যুবকরাই কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ মিশনের গৈরিক বসনধারী মুণ্ডিতমস্তক এক স্বামীজীকে নিয়ে এসে জাঁকিয়ে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালন করলেন। সেই যুবকদের একজন পঙ্কজ। তিনি বাবাকে বলেছিলেন, চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম হচ্ছে চাষাভুষোর ধর্ম। আর দেখ, রামকৃষ্ণের ধর্ম। শিক্ষিত ভদ্রলোক-সমাজের ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্ম অনাচারী।

ওই বৈষ্ণব নিগ্রহ আর ওই মন্তব্য বাবা ভুলতে পারেন নি। হয়তো প্রতিবাদী হওয়া উচিত ছিল। ঘটেছিল বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তিনি আখড়ার সংস্রব ত্যাগ করলেন। বাবার ভেক হয়েছিল। আমার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন আখড়ার বাবাজী মালসা ভোগ আর সংকীর্তন দিয়ে। আমার ভেক হল না।

এর পরই বাবা-মা দীক্ষা নিলেন শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের গোস্বামীর কাছে। বংশে সেই প্রথম ব্রাহ্মণের অনুপ্রবেশ ঘটল শুরু হিসাবে।

মা শহরের শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। তিনি বললেন, আমরা উচ্চবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত। এখন খুব ভালো হল। বাবা বললেন, আখড়ার হাত থেকে মুক্ত। বলতেও লজ্জা, ভাবতেও কেমন লাগত।

হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ গুরু হল। মানুষকে বলা যাবে।

বাবা বললেন, অদ্বৈত বংশ গো। মহাবৈষ্ণব বংশ। পুণ্য শ্লোক। মা বললেন, এবার ব্রাহ্মণ দিয়ে বাড়িতে নারায়ণ পুজো দেব। পাড়ায় লোকে কত রকম পুজো দেয়। বামুন পুরুত এসে পুজো করে। আমাদের নিজেদের পুজো করা। মেয়েমানুষের পুজো করা। ধোৎ।

মুশকিল বাধল এখানেই। কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজী নয় জাত বৈষ্ণবের বাড়ি পুজো করতে। না গো, বোষ্টম বাড়িতে পুজো করতে পারব না। আমাদের যজমান নিয়ে কাজ, সমাজ নিয়ে বাস। তারা রাগ করবে। মা-র নারায়ণ পুজো দেওয়া হল না। বাড়িতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রবেশ ঘটল আরও কিছুকাল পরে। বড়ো বোনের বিয়ের সময়।

তখনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পেশাদার পুরোহিত মেলে নি। শেষে এক শিক্ষিত চাকরীজীবী ব্রাহ্মণ যুবক রাজী হলেন। সমস্যা চুকল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে বোনের বিয়ে হল।

মা খুব খুশি। তিনি যা বললেন, তার অর্থ হল জাতে উঠলাম। বোনের বিয়ে কিন্তু জাত বৈষ্ণবের ঘরেই হল। এ ছাড়া হবেই বা কোথায়? জাতি কুল ছেড়ে এখানে আসা। প্রত্যাবর্তনের সুযোগ কোথায়? কার মধ্যে যাওয়া যাবে? বস্তুত জাত বৈষ্ণব হিন্দু সমাজের ভিতর একটি বর্ণে পরিণত।

॥ দুই॥

এখন একটি জেলা শহরে বাড়িঘর, বসবাস। একদিন পাড়ার এক ভাড়াটিয়া ভদ্রলোকের স্ত্রী আমার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন, আপনারা কী?

স্ত্রী বলেছেন, আমরা বৈষ্ণব।

বৈষ্ণব তো আমরাও। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমরা যেমন বামুন, তেমনি আপনাদের জাত কী?

আমরা বৈষ্ণব।

শুধুই বৈষ্ণব, জাত নেই — সে আবার কী? সে তো বাবাজীরা হয়। আখড়ায় থাকে, কপনি আঁটে। তিন চারটে সেবাদাসী নিয়ে ফুর্তি করে, আর ভিক্ষে করে খায়।

স্ত্রী বাড়ি ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কী লজ্জার কথা। যখন সেবাদাসী আর ভিক্ষের কথা বলল — তখন লজ্জায় মরি। বললাম, আমরা তা নই। আমরা গেরস্ত মানুষ — ভদ্দরলোক — গৃহী বৈষ্ণব। মহিলা বললেন, কি জানি। গৃহী বৈষ্ণব তো আমরা বলেই জানি। অন্য জাত নেই। শুধু বৈষ্ণব বলে জাত তো জানি না।

স্ত্রী ভুল করেছেন। বলা উচিত ছিল আমরা জাত বৈষ্ণব। গৃহী বৈষ্ণব বললে লোকে বোঝে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বর্ণাশ্রমী সমাজের মানুষকে। হওয়া উচিত বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব আর জাত বৈষ্ণব। কারণ গৃহী দু-পক্ষই।

ব্যাপারটা কি আমিই জানতাম ছাই। ঠেকে শেখা। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারী গবেষক অধ্যাপক ড. ওকনেল কিছু কাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। একদিন আমার কাছে এসে উপস্থিত। দেশ পত্রিকার কলা সমালোচক স্নেহভাজন সন্দীপ সরকার পাঠিয়েছেন।

ওকনেল জানতে চান বৈষ্ণব সমাজের আচার-আচরণ সম্পর্কে। বললাম, সে সব তো নবদ্বীপে পাবেন।

তিনি বললেন, নবদ্বীপে ছ-মাস ছিলাম। শাস্ত্র পড়েছি। এখন গৃহস্থের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চাই। আমার তখন এ বিষয়ে ধারণা বা জ্ঞানের পুঁজি প্রায় শূন্য। ভদ্রলোক দুপুরে এসেছেন। বিকালে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তিনি সাহায্য-প্রার্থী।

কাছেই এক অধ্যাপক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর বাবা একটি উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি নবদ্বীপের এক বৈষ্ণব গুরুর শিষ্য। তাঁর কাছেই নিয়ে গেলাম ওঁকে। ভদ্রলোক সাহেব দেখে দিশেহারা। সাহেব বাঙলায় প্রশ্ন করলে, তিনি দাঁত ভাঙা ইংরাজিতে উত্তর দেন। ওকনেল-এর প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি বৈষ্ণব দর্শন বোঝাতে শুরু করলেন। ওকনেল বললেন, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বলুন।

এবার গৃহী বৈষ্ণবের কথা উঠতেই আমি জাত বৈষ্ণবের কথা তুললাম। ভদ্রলোক বললেন, না। কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র আমরাই গৃহী বৈষ্ণব। তা কেন? ধর্মান্তরিত গৃহী বৈষ্ণব পরিবার? ভদ্রলোক এবার মুখ বিকৃত করে, ভঙ্গিতে ঘৃণা ছড়িয়ে বললেন। জাত বৈষ্ণব? ওরা বৈষ্ণবই নয়। বৈষ্ণব আমরা। বর্ণাশ্রম বিশ্বাসী। কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশিত পথের অনুসারী। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। একমাত্র যথার্থ বৈষ্ণব। অনভিজ্ঞতার কারণে মনে সেদিন ক্ষোভ জেগেছিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে।

কিন্তু ঠিক এমনি কথাই শুনতে হল, নবদ্বীপে। আখড়ায় বসে এক বৃদ্ধ বাবাজীর মুখ থেকে। বৃদ্ধ বাবাজীও মুখ বিকৃত করে বললেন। জাত বৈষ্ণব? ওরা বৈষ্ণব নয়। অনাচারী, ভ্রষ্ট, অশ্রদ্ধেয়। বৈষ্ণব বলতে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবকেই বোঝায়।

॥ তিন॥

বাঙলা দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি একটি দল?

কতো দল, উপদল। স্ব স্ব প্রধান। কে কার বিচার করে? প্রথমে একটি দলই ছিল। নবদ্বীপে। বৈষ্ণব আন্দোলনকারী বা ভক্তিবাদী দল। আদি নেতা শ্রী অদ্বৈত আচার্য। তারপর শ্রীগৌরাঙ্গই সর্ববাদীসম্মত নেতা। নবদ্বীপের জ্ঞানবাদী আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের আচরণের প্রতিবাদী হৃদয়বাদী আন্দোলন বলা যায় তাকে। মানবতাবাদীও বলা যায়।

ব্রাহ্মণের হাতে স্মৃতিশাস্ত্র রচনার ভার। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আচরণবিধি তৈরি করে দেবেন তাঁরা। সকলে বিনা প্রতিবাদে তাকেই মান্য করতে বাধ্য, তা সে যত আপত্তিকর, অবিবেচনাপ্রসূত বা যত অমানবিকই হোক। তাঁরা লিখেছিলেন, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণেতর রমণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং যদি তাকে দণ্ড দিতেই হয়, তবে তাকে একটা সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে। কিন্তু অব্রাহ্মণ কেউ যদি ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তা গর্হিত কর্ম বলে ধরতে হবে এবং তার অপরাধ হবে ক্ষমার অযোগ্য। তাকে দিতে হবে গুরুদণ্ড। স্মার্ত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এই বিধান।

পাঠান যুগে কায়স্থ সমাজের অনেকে ভূস্বামী, জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল। সেকালে এই প্রতিপত্তির ঘোষণা হত মন্দির প্রতিষ্ঠায়, বাড়িতে নানা পূজা পার্বণের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। স্মার্ত রঘুনন্দন বিধান তৈরি করে দিলেন যে বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেই শূদ্র। কায়স্থরাও শূদ্র। শূদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রচর্চা, ধর্মনেতা হওয়া নিষিদ্ধ। কায়স্থ ভূস্বামীরা মন্দির গড়ে বিগ্রহ স্থাপন করে জাঁকজমক করে সমাজে বাহবা নেবে, সে সুযোগও বন্ধ করে দেওয়া হল এই নির্দেশ দিয়ে যে ব্রাহ্মণ কোনও শূদ্রের বাড়ি পুজো করবে না এবং কোন ও শূদ্রের দান গ্রহণ করবে না। ব্রাহ্মণের সেবা করা ছাড়া শূদ্রের আর কোন্ ও ভূমিকা নেই। নারী সমাজকে ফেলে দেওয়া হল শূদ্রের পর্যায়ে, বিধিনিষেধের মধ্যে। কায়স্থ শূদ্র হয়ে যাওয়ায়, মন্দির গড়ে বিগ্রহ স্থাপন ও পূজার্চনায় পুরোহিত পাবে না আর।

আশ্চর্য কথা — সমগ্র সমাজ বিনা প্রতিবাদে নতশিরে এই অপমানকর নির্দেশ মান্য করে নিয়েছে। তাই রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করে আর পুরোহিত পান না। শেষে এগিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দাদা। কিন্তু সেখানেও মন্দির উৎসর্গ করে দিতে হল তাঁর নামে।

রঘুনন্দনের কালে, তাঁর নির্দেশের ফলে যখন সমস্ত অব্রাহ্মণ সমাজ নতশির, বিপন্ন, অসহায়, তখনই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। প্রতিবাদী ভূমিকায়।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ শূদ্রের দান গ্রহণ করবেন না। তাদের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করবেন না। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণ সমাজের অর্থাভাব ছিল না। তাঁদের এই অর্থকৌলীন্যের উৎস কী ছিল? কার দানে তাদের এত পরিপুষ্টি?

এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের অর্থকৌলীন্য-জাত জীবন-যাপনের একটি বিবরণ মেলে বৃন্দাবন দাসঠাকুরের চৈতন্যভাগবতে

ধর্মকর্ম লোকে সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত গায় জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন।।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।। [২]

গৌরাঙ্গদেব শুরু করলেন ভক্তিবাদী আন্দোলন। নবদ্বীপের সর্বসাধারণকে বললেন :

দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া।।
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।। [৩]

দেবদেবী নিয়ে মাতামাতি নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কৃপাপ্রার্থী হওয়া নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনাও নয়। তোমার ঈশ্বরকে তুমি নিজে প্রাণ ভরে ডাক, ঘরে বসে। দেবালয়ে যেতে হবে না। কারও অনুগ্রহ প্রার্থনাও করতে হবে না।

স্মার্ত ব্রাহ্মণদের প্রতি এ তো একটা চ্যালেঞ্জ। আরও আছে। শূদ্র এবং নারীর ধর্মীয় এবং অনেক সামাজিক অধিকার খর্ব করেছে স্মৃতিশাস্ত্র। তারা ব্রাহ্মণের দীন সেবকে পরিণত।

গৌরাঙ্গদেব আর অদ্বৈত আচার্যর মধ্যে তাই কথা হল :

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইব।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে।।
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়া।। [৪]

এই কথোপকথনের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের জীবনযাপন ধারার বিপরীত মতিগতি নিয়েই গৌরাঙ্গর দিন কাটছে তখন। নবদ্বীপের শূদ্র সমাজের পল্লীতে যাতায়াত করছেন তিনি। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। নান গ্রাম-সম্পর্ক স্থাপন করছেন। এবং তাদের প্রিয় হয়ে উঠছেন।

নবদ্বীপে তখন বৈশ্যরা ছিল বৌদ্ধ। নবশাক সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণী। তাঁতি তিলি তাম্বুলি গোয়ালা ইত্যাদি হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে ছিল অবহেলিত ফলে তারা বৌদ্ধ বৈশ্যদের সঙ্গেই মেলামেশা করত। এবং তাদের ধর্মকর্ম দ্বারাই প্রভাবিত ছিল।

গৌরাঙ্গর সংস্পর্শে এসে, নতুন সাম্যবাদী ধর্মমত শুনে এবং দলবদ্ধ হয়ে সর্বসম্প্রদায় মিলে কীর্তনের সুযোগ পেয়ে নবশাক সমাজ বৌদ্ধদের ত্যাগ করে গৌরাঙ্গ-ভক্ত হয়ে উঠল।

গৌরাঙ্গর এই ভূমিকা হিন্দু সমাজকে সুসংহত করারই ভূমিকা। তিনি এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নতুন, মানবিক, উদারতাপূর্ণ একটি সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই অনুমিত হয়।

এখন অবশ্য বলা হচ্ছে। গৌরাঙ্গর এমন কোনো স্বপ্ন বা বাসনা যে ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। জাতিভেদ নিয়ে কোনো আন্দোলন করেন নি। নিজে ব্রাহ্মণ্য আচার মান্য করে চলেছেন সর্বদা। পতিতোদ্ধার বিষয়েও পণ্ডিত সমাজের ব্যাখ্যা হচ্ছে।

"পতিতদের উদ্ধারকর্তা রূপেই চৈতন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখানে 'পতিত' এবং 'উদ্ধার' শব্দ দুটির প্রযৌক্তিক অর্থ আছে। পতিত অর্থ সর্ববর্ণের সর্বজাতির, সর্বাবস্থার

অবৈষ্ণব। উদ্ধার অর্থ, তাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাদান। এই প্রযৌক্তিক অর্থে চৈতন্য আন্দোলন ছিল একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। স্পষ্টভাবে চৈতন্য এবং তাঁর সমর্থকগণ সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন নি। কিন্তু অনুদার ধর্মদ্বারা যে সমাজ আবদ্ধ ছিল বৈষ্ণবীয় উদারতার সঞ্চারে তাতে প্রগতির লক্ষণ ফুটে ওঠে।"[২] স্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা গৌরাঙ্গদেব সমাজ সংস্কার আন্দোলন করেন নি। বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সামাজিক অবস্থান্তরের আয়োজন। তাই ভক্তিবাদের প্রচার সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিতবাহী হয়ে জনমনকে আশান্বিত করে তুলেছিল।

চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ — মতবাদ নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণের অচলায়তন অধিকারের বিরোধিতা বা তার প্রতি অস্বীকৃতির ঘোষণা।

গৌরাঙ্গদেব ঘরে বসে গুরু মহান্ত সেজে লোকের কানে মন্ত্র দিয়ে বৈষ্ণব আন্দোলন বা পতিতোদ্ধার কর্ম সম্পাদন করেন নি। তিনি জনসংযোগ করেছিলেন, মানুষের দরজায় গিয়ে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, এসো, একসাথে ঈশ্বরের নাম গান করি।

যেভাবে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন, নবদ্বীপে থাকতে পারলে তাঁর এই আন্দোলন কোন পথে মোড় নিত অর্থাৎ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের রূপ নিত কিনা, তা কে বলতে পারে। তার সম্ভাবনার আভাস যে একেবারে মেলে না, তা নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীচৈতন্য হয়ে পুরীতে অবস্থান করছেন। বঙ্গদেশে নিত্যানন্দ তাঁরই নির্দেশে বৈষ্ণব আন্দোলন চালাচ্ছেন। নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক প্রধান উদ্ধারণ দত্তকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করে, তাঁর বাড়িতে থাকছেন। তার হাতে খাচ্ছেন। সুবর্ণবণিক সমাজ ব্রাহ্মণের কাছে জল-অচল সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ সেখানে অবস্থান করছেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের কাছে এসব কর্ম তো ঘোর অনাচার। অতএব নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ যিনি চৈতন্যর সহপাঠী ছিলেন, পুরীতে ছুটে গেলেন। এবং নিত্যানন্দর এই অনাচার-কথা চৈতন্যর কানে তুললেন। ব্রাহ্মণ আশা করেছিলেন যে চৈতন্য রাগ করবেন। বিরূপ হয়ে উঠবেন নিত্যানন্দর প্রতি। এবং তাঁকে শাসন করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে আশা পূর্ণ হল না। শ্রীচৈতন্য শান্ত ভাবে জানালেন, নিত্যানন্দ সিদ্ধপুরুষ। সে যা করে তাতে দোষ হয় না। শ্রীচৈতন্যর এই মনোভাবকে লঘু করে দেখার ব্যাপার নয়। নিত্যানন্দকে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য তিনিই নিয়োগ করেছেন। এখন নিত্যানন্দর কার্যকলাপকে সমর্থন করলেন, সুকৌশলে। এটা তাঁর মানসিক প্রবণতারই প্রকাশ। মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই-এর বাস্তব প্রয়োগ। যাকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করা হল, সে তখনও থেকে গেল অস্পৃশ্য? তাহলে দীক্ষা আর মন্ত্রের কোন শক্তি এবং সার্থকতা? যে মন্ত্র অপবিত্রকে পবিত্র করতে পারে না, যে গুরু শিষ্যকে উদ্ধার করতে পারে না, তার কোন মূল্য?

শ্রীগৌরাঙ্গর পক্ষে নবদ্বীপে থাকা সম্ভব হল না। তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলন না করে, নিছক নিরীহ ভক্তিবাদী যে আধ্যাত্মিক প্রচার শুরু করেছিলেন, তাতেই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজ বিচলিত হয়ে তাঁকে চরম আঘাত হানতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। অবশ্যই সেদিনের সংঘাতটা খুব সহজ আকারের ছিল না। ব্রাহ্মণ সমাজ চেয়েছিল কাজীকে কাজে লাগিয়ে কার্যোদ্ধার করতে। কাজীর ভয়ে গৌরাঙ্গর কীর্তন প্রচার দমিত হয়ে যাবে। সাধারণ নবদ্বীপবাসী আর মাতামাতি করবে না কীর্তন নিয়ে। কিন্তু গৌরাঙ্গর সাহস এবং সংগঠন শক্তি কাজীকে দমিত করে ফেলল। বিপন্ন ব্রাহ্মণ-সমাজ তখন ছাত্রসমবায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। কারণ সংগঠনের জোরে গৌরাঙ্গ কাজীকে দমন করতে পেরেছেন। এবার ছাত্রসমবায় গৌরাঙ্গকে আঘাত হানবে। সেদিন তা যদি হত অর্থাৎ গৌরাঙ্গর ওপর যদি আঘাত আসত, তাহলে তাঁর সংগঠিত বিপুল শক্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণ সমাজের ওপর প্রত্যাঘাত হানত, বলেই মনে হয়। এবং তা এক ভয়াবহ দাঙ্গার রূপ নিত। আর তখনই অপমানিত কাজী প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগে গৌরাঙ্গর ভক্তি আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দিত সহজেই। কে জানে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের পিছনে এমন পরিকল্পনা ছিল কিনা।

কিন্তু গৌরাঙ্গর বুদ্ধিমত্তায় সে সম্ভাবনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। বস্তুত তিনি গৃহত্যাগে বাধ্য হলেন। বলা যায়, তাঁকে বিতাড়িত করা হল নবদ্বীপ থেকে।

জয় হল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের। পরাজয় ঘটল গৌরাঙ্গর ভক্তি আন্দোলনের। যার মূল কথা ছিল :-

ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।। [৪]

সংস্কৃত বিশারদ সুপণ্ডিত মুরারি গুপ্তকে গৌরাঙ্গ বলছেন :

শুন শুন ওহে বৈদ্য আমার বচন।
এড় গীতা অধ্যাত্ম চরচা তোর মন।।
জীবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।

কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর।।
অন্যান্য চরচা তব কর পরিত্যাগ।
গুণ সংকীর্তন কর কৃষ্ণ অনুরাগ।।

অদ্বৈত আচার্য জ্ঞানবাদের পক্ষপাতী হয়ে উঠছেন শুনে, যে নিমাই পণ্ডিত শান্তিপুর ছুটে গিয়ে বৃদ্ধ আচার্যকে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সামনে মারধর অবধি করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁকেই নবদ্বীপ ছেড়ে যেতে হল। জ্ঞানবাদী আচারসর্বস্ব পণ্ডিতরাই নবদ্বীপবাসী হয়ে থাকলেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব আন্দোলনের বড়ো পরাজয় এই জন্য যে দলের প্রাণপুরুষ গৌরাঙ্গদেবই চলে গেলেন। আন্দোলনের ভরাডুবি হয়ে গেল। বঙ্গজন সমাজ তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

এরপর দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সুদূর পুরীতে বসে নিরুপায় ভাবে, আক্ষেপের সুরে নিত্যানন্দকে বলছেন, তুমিও যদি মুনি ধর্ম নিয়ে পুরীতে এসে বসে থাক তা হলে আমার প্রতিজ্ঞার কী হবে? আমি যে বলেছিলাম, বাঙলায়, নীচ পতিত মূর্খদের উদ্ধার করব?

এই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সন্ন্যাস নেবার বাসনা তাঁর ছিল না। স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভক্তি ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বঙ্গদেশে একটি সুন্দর সুসংহত সমাজ গড়ে তুলবেন। যেখানে, নারী শূদ্র থেকে চণ্ডাল অবধি সকলেই মানুষের ন্যায়সঙ্গত মর্যাদা লাভ করবে। সন্ন্যাস নেওয়ায় তার যেন জলের মাছ ডাঙায় ওঠার অবস্থা। বাইরে সন্ন্যাসীর বেশ, অন্তরে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। শেষে নিজের স্বপ্নকে সার্থক করার দায় তুলে দিচ্ছেন নিত্যানন্দর ওপর। এর চেয়ে বড়ো পরাজয় বৈষ্ণব আন্দোলন এবং গৌরাঙ্গর আর কী হতে পারে? গৌরাঙ্গর বিকল্প কি নিত্যানন্দ? তবু গৌরাঙ্গর পরামর্শমতো নিত্যানন্দ বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে জন সংযোগ, করেছেন আর গেয়েছেন। ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গর নাম রে। তবু গৌরাঙ্গ আন্দোলনের সে বেগ এবং আবেগ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ আন্দোলন সুসংগঠিত ছিল না। সময়ও বড় অল্প। মাত্র তের মাস (১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিক পর্যন্ত) গৌরাঙ্গদেব ভাব প্রকাশ করেছিলেন। তারপরই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ, সহসা। পরিকরগণ এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আন্দোলন ছিল ভাবপ্রধান। ফলে আন্দোলন ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় এবং পরিকরদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত থাকায় সহজেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বৈষ্ণব আন্দোলন বহু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

অদ্বৈত আচার্য তখন বৃদ্ধ। তাঁর পক্ষে ভক্তিপ্রচার আর সম্ভব ছিল না। তাঁর শিষ্য ঈশান নাগর আর দুই শিষ্য কৃষ্ণদাস এবং শ্যামাদাস আচার্য, অদ্বৈতর স্ত্রী সীতা দেবী, পুত্র অচ্যুতানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন, এবং সম্প্রদায় গড়ে তুললেন।

অদ্বৈত আচার্য বিদ্রোহী পুরুষ। বৈষ্ণবতার কারণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে সঙ্গে তাঁর বিরোধ বরাবর। শান্তিপুরে বসে সামাজিক কাজের সময় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উপস্থিতিতে তিনি হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে তিনি পাষণ্ডী বলতেন। তাদের সর্বনাশ কামনা করতেন। ফলে শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ সমাজও তাঁকে পরিহার করে চলত। শান্তিপুরে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন সামাজিক দিক থেকে।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র এই বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন, শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে আপস করে। অর্থাৎ অদ্বৈতর বিদ্রোহী ভূমিকা থেকে সরে এসে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ফলে আচার্য-পন্থী গোস্বামীরা রক্ষণশীল হয়ে পড়লেন।

নিত্যানন্দপন্থীরা খড়দহে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুললেন। তাঁরা অবশ্য তখন উদারপন্থীই ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রসমূহ বাঙলাদেশে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে মোটামুটি যে সব সম্প্রদায় এবং উপাসনা পদ্ধতি ছিল, তা হচ্ছে:

"(ক) চৈতন্য পূজা
(খ) অদ্বৈত আচার্যর শ্যালক শান্তিপুর বর্ধমানের কোন কোন গ্রামে। মালদহের কোন কোন গ্রামে, তেওড়া প্রভৃতি স্থানে এবং শ্রীহট্টর 'লাউড়' নামক স্থানে সক্রিয় ছিলেন।
(গ) নিত্যানন্দ মতবাদে বিশ্বাসী বৈষ্ণবগণ বাংলা দেশে প্রায় সর্বত্র সখ্যভাব এবং দাস্যভাব প্রচার করেছিলেন। বিশেষ করে দ্বাদশ গোপাল মধ্য রাঢ় অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিলেন।
(ঘ) বর্ধমানের কাছে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন গৌর নাগরবাদ প্রচার করেন।
(ঙ) গদাধর পণ্ডিতের গদাই গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় নবদ্বীপে, বীরভূমে এবং ঢাকার বিক্রমপুরে স্থানীয় ভিত্তিতে জনপ্রিয় ছিল

(চ) এই সব চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব ছাড়াও বহু সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল। অদ্বৈত আচার্যর শিষ্যদের মধ্যেও স্বাধীন ভাবে সম্প্রদায় গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।"

এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ চলতই। এ ছাড়াও উপদল ছিল। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক সম্প্রদায়, শ্রীবাস পণ্ডিতের শিষ্য সম্প্রদায়, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের 'রসরাজ' সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব আন্দোলনকারী গৌরাঙ্গ পরিকরদের ঐক্য আর থাকল না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রধান কারণ উপাসনা পদ্ধতির অমিল। ব্যক্তিগত সম্পর্কর প্রশ্নও ছিল। এই সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটিও বিবেচ্য। অর্থনৈতিক কারণে দল উপদল তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবে।

বৈষ্ণব আন্দোলনে হোম যজ্ঞ পুজো পুরোহিতপ্রথা বাতিল করেছিল। কিন্তু তার স্থলে প্রবর্তিত হল গুরুবাদ। গুরু ছাড়া দীক্ষা নেই, মুক্তি নেই। ঘরে বসে হাতে তালি দিয়ে নাম গান করলেই মুক্তি মিলবে না আর। পথপ্রদর্শক গুরু চাই। গুরু ঈশ্বরতুল্য। পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়ার মতো গুরুকে প্রণামী দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। নইলে গুরুই বা জীবন ধারণ করবেন কীভাবে? শিষ্যর বাড়িতে জন্ম মৃত্যু বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় গুরুবরণ গুরুপ্রণামী বাঁধা। শিষ্যর সামর্থ্যানুযায়ী গুরুপ্রণামী। সেটা পাঁচ সিকা থেকে একটি জমিদারী অবধি হতে পারে প্রাপ্তি।

তাহলে যিনি যত শিষ্য করতে পারবেন তাঁর তত আর্থিক নিশ্চয়তা বাড়বে, সাংসারিক দুর্ভাবনা কমবে। প্রধান গুরুর অধীনে সহকারী গুরু হিসাবে কাজ করলে মূল গুরুকে প্রণামীর সিংহ ভাগ দিয়ে দিতে হয়। স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে গুরুগিরি করতে পারলে আর কাউকে ভাগ দিতে হয় না।

তাই দল ভেঙে উপদল। এক থেকে বহু।

শ্রীবাসের দারিদ্র্য দেখে শ্রীচৈতন্য চিন্তিত হয়েছিলেন একদিন। চৈতন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, ঘরে বসে না থেকে উপার্জনের চেষ্টা করবে। শ্রীবাস হরিনাম জপ ছেড়ে অন্য কাজ করতে সম্মত হন নি। হাতে তিন তালি দিয়ে বলেছিলেন, তিন দিন যদি কিছু না জোটে, যদি উপবাসে থাকি, তাহলে চতুর্থ দিনে গঙ্গায় ডুবে জীবন বিসর্জন দেব। চৈতন্য শুনে চমকে উঠে বলেছিলেন, শ্রীবাস তোমার অন্নাভাব থাকবে না। তুমি দারিদ্র্যমুক্ত হবে। দেখা যায়, শ্রীবাসের দারিদ্র্য ঘুচেছিল। তিনিও একটি শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

নিত্যানন্দ তো উদ্ধারণ দত্তর মতো সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠী সুবর্ণ-বণিকদের শিষ্য করতে পেরে বিত্তশালী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরভদ্র বিপুল ধনের অধিকারী হয়ে রাজার মতন জীবনযাপন করতেন। তা সম্ভব হয়েছিল গুরুগিরির কারণেই। গুরুগিরি লোভনীয় ব্যবসা হয়ে উঠেছিল। জমিদারের প্রজার মতো শিষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল গুরুর সম্পদ। তাই এত দল উপদলেরও সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা চৈতন্য আন্দোলনের সঙ্গে সামান্য ভাবেও যুক্ত ছিলেন — তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা গুরু গোস্বামী হয়ে শিষ্য সংগ্রহে লেগে পড়লেন।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজ কৃর্মবৃত্তি অবলম্বন করে বসে বসে পুরনো কাসুন্দি ঘাটছিলেন। বৈষ্ণব আন্দোলন ব্রাহ্মণ সমাজের সামনে গুপ্ত ধনের নতুন দুয়ার খুলে দিল।

চৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দর জীবলীলা শেষ হল। বাঙলার বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত। তাঁরা কেউ বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব বা বিধিবিধান রচনা করে যান নি। তাঁরা শুধুই নাম মন্ত্র প্রচারক।

পরবর্তী নায়করা এসবের অভাব বোধ করতে থাকলেন। তাঁরা চান এলোমেলো অবস্থা গুছিয়ে তুলে বাঙলার বৈষ্ণব আন্দোলনকে সুসংহত রূপ দিতে। তা করতে হলে চাই একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা দর্শন। আবেগসর্বস্বতা স্থায়িত্বের ভিত্তি নয়।

নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। প্রয়োজন বোধ করতেন না। বাঙলার এই আন্দোলনের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী সমাজেরও প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ ছিল না।

এখন অর্থাৎ বাঙলার পরবর্তী বৈষ্ণব নেতারা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী, জাহ্নবা দেবী, উদ্ধারণ দত্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দত্ত, রামচন্দ্র (বাঘনা পাড়া), নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এঁদের অভাব মোচন করেছিলেন। বৃন্দাবনে তখন বিশিষ্ট ছ-জন গোস্বামী ছিলেন। তাই ষড়-গোস্বামী বলা হয়। এঁরা হচ্ছেন, রূপ ও সনাতন — দুই ভাই। এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ দাস ছাড়া বাকি পাঁচ জনই ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতবিশারদ সুপণ্ডিত। কিন্তু এই পাঁচজনই অবাঙালি। দক্ষিণ ভারতীয় কট্টর ব্রাহ্মণ। রূপ সনাতন এবং জীব গোস্বামী বাঙলা দেশে ছিলেন।

রূপ ও সনাতন ছিলেন হুসেনশাহর মন্ত্রী। অভিজাত আমলা। এঁরা বোধহয় বাঙলা ভাষাও জানতেন না। বাঙলার জনজীবনের সামাজিক সমস্যা বিষয়ে জানার প্রশ্নই ওঠে না।

এঁরা বৃন্দাবনে যাবার পর থেকে আর বাঙলাদেশে আসেন নি। গোপাল ভট্ট আর রঘুনাথ ভট্ট তো বাঙলার মুখই দেখেন নি। তাঁরাই বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের জন্য ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মানসিকতা, প্রবণতা, সংস্কার আরোপিত হল বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের ওপর। বাঙলার জনসমাজের প্রয়োজন থেকে তা গড়ে উঠল না। চৈতন্য ভাগবতে লেখা হয়েছে:

গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড ঘুরি কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দে বৃথা যাইবারে নাশ।। — চৈ. ভা. ২/৬

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে লক্ষ করে একথা লেখা হয়েছিল। এখন বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ-এর জন্যও অনুরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারযোগ্য গ্রন্থসমূহ নির্মারিত হল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট গোস্বামী বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের জন্য লিখে দিলেন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-শাস্ত্র প্রভাবিত বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র বা সদাচার গ্রন্থ — হরিভক্তি বিলাস। বৈষ্ণবের করণীয় বিষয়ে যাবতীয় বিধিবিধান নির্দেশিত হয়েছে এর ভেতর।

হরিভক্তি বিলাসের কঠোর অনুশাসন — ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হবে। বর্ণাশ্রম মানতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্মের আচার-বিচার মানতে হবে। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মানুষকে দীক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু অব্রাহ্মণ সে যত বড় বৈষ্ণবই হোক, ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দানের অধিকারী হবে না। অনুলোম প্রথায় চলবে। অর্থাৎ সমাজের যে যেখানে আছে, সে সেখানেই থাকবে। বৈষ্ণব হওয়ার সুবাদে তার সামাজিক কোনো অবস্থান্তর ঘটবে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকবে, চণ্ডাল থাকবে চণ্ডাল হয়েই। চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ — চৈতন্য গোষ্ঠীর এ তত্ত্ব পরিত্যক্ত।

বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে।।
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুরিয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা।।

অদ্বৈতর এ স্বপ্নর অপমৃত্যু ঘটল। নামগুণ গেয়ে নাচার পরিবর্তে চণ্ডালই পুড়ে মরল। বিদ্যা আর কুলের শাণিত কুঠারাঘাতে অদ্বৈত চৈতন্যর স্বপ্নের মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল।

'হরিভক্তি বিলাস-'এ উপাসনা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণেরও নির্দেশ আছে। বঙ্গদেশে কেউ সখা ভাবে, কেউ দাস্যভাবে, কেউ রাধা ভাবে, কেউ গৌরাঙ্গকে নাগর রূপে কল্পনা করে উপাসনা করতেন। বৃন্দাবনী তত্ত্বে নির্দেশিত হল, মঞ্জুরী ভাবের উপাসনা করতে হবে। মধুর ভাবের সঙ্গে দাস্যভাব মিলিয়ে শ্রীরাধার দাসী বা সখী ভাবে উপাসনা করতে হবে। এরই নাম মঞ্জুরী সাধনা।

বৃন্দাবনী তত্ত্ব তো এল। বাঙলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি তা গ্রহণ করলে তবে তো। কেউ তো কারও অধীন নয়। সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। এখন তাদের বুঝিয়ে সম্মত করাবার চেষ্টা শুরু হল। তার প্রধান উদ্যোক্তা বলা যায় জাহ্নবা দেবীকে। তিনিই অগ্রগণ্য বৈষ্ণব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বোঝাতে লাগলেন। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কয়েকটি বৈষ্ণব সম্মেলন করা হল। শেষে রাজশাহীর 'খেতুরি-'তে নরোত্তম দাস (দত্ত) ঠাকুর আয়োজিত সম্মেলনে বৃন্দাবনী তত্ত্ব বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হল।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-নেতৃত্বে পরিচালিত যে বৈষ্ণব আন্দোলন জনমনে উদ্দীপনা এবং আশার সঞ্চার করেছিল, তার ইতি হয়ে গেল এখানেই। জয় হল ব্রাহ্মণ্যবাদের।

কিন্তু বাঙলার সকল বৈষ্ণব-প্রধানই যে নির্বিচারে বৃন্দাবনী তত্ত্বের সবকিছু মেনে নিয়েছিলেন, তা নয়। কিছু ছাড় দিয়ে আপস করতে হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। নরোত্তম দাস ঠাকুর কায়স্থ। হরিভক্তি বিলাস-এর বিধিমতে তিনি ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দানের অধিকারী নন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁর আয়োজিত খেতুরি সম্মেলনে, সভায় প্রস্তাব এনে তাঁকে ব্রাহ্মণ-তুল্য বলে সর্বসম্মতি ক্রমে ঘোষণা করা হল। অর্থাৎ তিনি কায়স্থ হলেও ব্রাহ্মণের গুরু হবার অধিকার লাভ করলেন।

এর দ্বারা বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, কর্তৃক গৃহীত হল।

আশ্চর্য কথা, নরোত্তম দাস-এর মতো ব্যক্তি নিজে কায়স্থ থেকে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে খুশি হলেন, কিন্তু কায়স্থ সমাজের কথা ভাবলেন না।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ। পরম বৈষ্ণব। খেতুরি সম্মেলনের সময় সম্ভবত তিনি জীবিত ছিলেন না। এঁরা গৌর নাগরবাদী। এই পরিবারও তাঁদের গৌর নাগরবাদ তত্ত্ব পরিত্যাগ করলেন না। তাঁরাও

ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান করতেন। সে অধিকারও তাঁরা ছাড়লেন না। বস্তুত তাঁরা বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের ধনবল, জনবল ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রবল থাকায় কেউ আর ঘাঁটাতে সাহস করেন নি।

মেদিনীপুরে-গোপীবল্লভপুর-ধারেন্দার বৈষ্ণবগুরু শ্যামানন্দ এবং তাঁর প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ ছিলেন সদ্‌গোপ। তাঁরা নির্বিচারে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই দীক্ষাদান করে চললেন। মেদিনীপুরের ধনী প্রতাপশালী ভূঁইয়া, জমিদার এমনকি ক্ষমতাশালী মুসলমান ফৌজদার পদাধিকারী ব্যক্তি অবধি তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণবতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

হরিভক্তি বিলাস-এর নির্দেশ সেখানেও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেল না। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাহসের অভাবেই।

ব্রাহ্মণ সদ্‌গোপকে গুরু স্বীকার করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করছেন। সেদিনের বঙ্গদেশে অকল্পনীয় ঘটনা ছাড়া আর কি?

কেবল শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য জয়গোপাল দাস কায়স্থ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতে চাওয়ায় এবং বৈষ্ণবের জাতি বিচার নীতির বিরোধিতা করায়, বীরভদ্রের নির্দেশে তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হল। আর যে বীরভদ্র উদার মনোভাব নিয়ে বহু বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করায় রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন, তিনিই হয়ে গেলেন চরম রক্ষণশীল। মেয়ের বিয়ে দিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ খুঁজে।

অদ্বৈত আচার্যর পরিবার আগেই রক্ষণশীলতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব গুরু মাত্রেই হয়ে উঠলেন নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাঁদের প্রথম পরিচয় ব্রাহ্মণ। তারপর বৈষ্ণব। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কুলীন সন্ধানী। সে কুলীন পরিবার শাক্ত শৈব ঘোর বৈষ্ণব-বিরোধী — যাই হোক।

এই আচরণ প্রমাণ করে, ব্রাহ্মণ-সংস্কার বা জাত্যাভিমান তাঁদের মনে ছিলই। তাঁরা বৈষ্ণবতায় আটকা পড়েছিলেন। এখানে গুরু-মহান্ত, গোস্বামী হবার সুযোগ মিলছে। ধনে জনে বলীয়ান হয়ে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া যাচ্ছে — অন্য এক সুখ সৌভাগ্য মিলছে। তাই একে মেনে নেওয়া।

'হরিভক্তিবিলাস' ব্রাহ্মণত্বকে নিরাপত্তা দান করল। এঁরা এবার স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকলেন। এঁরাই 'হরিভক্তিবিলাস' অনুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এঁদের দৃষ্টিতে, বঙ্গদেশের অন্য যাবতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় — অনাচারী, ভ্রষ্ট, অশ্রদ্ধেয়, অবৈষ্ণব।

॥ চার ॥

বলা হয়ে থাকে, শ্রীচৈতন্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলন করেন নি। ধর্ম আন্দোলনও নয়। শুধু ভক্তি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। সেটাই বা করতে গেলেন কেন? ভক্ত হয়ে ঘরে বসে ঈশ্বরের সঙ্গে লীলা করলেই তো পারতেন।

পতিতোদ্ধারের বাসনা সমাজ চিন্তারই প্রতিফলন। তিনি আবার উদ্ধার করতে চাইলেন নারী, শূদ্র নীচ অধম দরিদ্র মূর্খ থেকে চণ্ডাল অবধি। পতিতোদ্ধারের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, নারী, শূদ্র, নীচ, চণ্ডাল — এই নির্দিষ্ট শব্দগুলি সর্বত্তরের অবৈষ্ণবকে বোঝায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ — যাদের পাষণ্ডী বলা হচ্ছে, উদ্ধারের তালিকায় তাঁদের নাম নেই কেন? অবৈষ্ণব হিসাবে তাঁদের নাম আগে থাকা উচিত ছিল। এবং প্রথম সেখান থেকেই পতিতোদ্ধার কর্ম শুরু করা প্রশস্ত ছিল। ধর্ম ও দর্শন চর্চার ও ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের অধিকার তখন ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা মানলেই সমাজমান্য হয়ে যেত। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে দিয়ে ভক্তিবাদ মান্য করাতে পারলেই গৌরাঙ্গদেব বড়ো গুরু মহান্ত হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সে পথে না গিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের দ্বারস্থ হলেন কেন?

তথাগত বুদ্ধের কথা মনে পড়ে। রাজপুত্র রাজা হয়ে মহারাজা হবার চেষ্টা না করে রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এসে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। গৌরাঙ্গদেবের উত্থানও সেভাবেই। শেষ রক্ষা হয় নি। তাই নানা বিরুদ্ধ ব্যাখ্যায় তাঁর মূল প্রবণতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

চৈতন্য কথা ভাবতে গেলেই তৎকালীন সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা এসে যায়। চৈতন্যর কার্যবলী নিছক আধ্যাত্মিক ভক্তি প্রচার হলে সমাজে এত আলোড়ন, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা জাগত না।

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে ''... অনুদার ধর্ম দ্বারা যে সমাজ আবদ্ধ ছিল, বৈষ্ণবীয় উদারতার সঞ্চারে তাতে প্রগতির লক্ষণ ফুটে ওঠে।''

এ সম্পর্কে বোধহয় বলা যায়, বৈষ্ণবীয় উদারতা

গৌরাঙ্গদেবকে আকৃষ্ট করেছিল বলেই তিনি ভক্তিবাদী হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। সামাজিক প্রগতিই ছিল তাঁর কাম্য। না হলে ভক্তি প্রচারে পতিত উদ্ধারের প্রসঙ্গও আসত না। শাক্ত কি শৈব মত-প্রচারকেরা পতিত উদ্ধারের কথা বলেছেন?

পাল রাজত্বের অবসান ঘটল। দক্ষিণ ভারতীয় সেন বংশের রাজত্ব শুরু হল। এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজ সংগঠন ব্যাপারটা যুক্ত ছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। ফলে সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এবং আধিপত্য ছিল। সেন রাজারা বৌদ্ধ বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যবাদী, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁরা এসে বঙ্গদেশে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, বৌদ্ধ প্রভাবকে উৎসাদন করে। সে কাজ শুরুত্ব দিয়ে তৎপরতার সঙ্গেই শুরু করেছিলেন তাঁরা। বল্লাল সেন সে কারণেই বাঙলার সমাজ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সে কাজের জন্য তিনি কনৌজ থেকে সুপণ্ডিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদের আনিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সংস্পর্শে আবিলতাপ্রাপ্ত সমাজকে সংস্কার করিয়ে হিন্দু সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল উদ্দেশ্য। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ দেশ জুড়ে সে মহাযজ্ঞ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু বল্লালের পর লক্ষ্মণ সেন-এর রাজত্বকালেই সেন রাজত্বকে বিদায় নিতে হল। এসে গেল মুসলমান শাসন।

এত অল্প সময়ে অগোছালো সমাজকে গুছিয়ে সুশৃঙ্খল শাসনে আনা সম্ভব হয় নি ব্রাহ্মণদের পক্ষে। রাজ্যহারা, রাজাহারা, বিদেশী ব্রাহ্মণদের তখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর পথ ছিল না। এই পরিস্থিতি চৈতন্য আমলেও।

লক্ষণীয় — বাঙলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র আছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অনুপস্থিত। কান্যকুব্জের আর্যসমাজ বিন্যাস এখানে নেই। কারণ বঙ্গদেশ আর্যভূমি নয়, এখানে আর্যসমাজ নেই। বাঙলার জন সমাজকে আর্যকরণের চেষ্টা হয়েছে। এখানেও ক্ষত্রিয় ছিল। তারা আর্য নয়। দেশজ ক্ষত্রিয় — হাড়ী ডোম বাগ্দী বাউরি, আগে ডোম বাগে ডোম, ঘোড়ায় ডোম সাজে — ছড়া তারই ইঙ্গিতবাহী। আর বৈশ্যরা, শ্রেষ্ঠীরা ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাই বল্লালী ব্যবস্থায় যে বর্ণাশ্রম হিন্দু সমাজ গঠিত হয়েছে, সেখানে আছে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। শূদ্রের আবার দুটি ভাগ — সৎশূদ্র আর অসৎশূদ্র। যাদের জল আচরণীয় তারা সৎশূদ্র। যাদের জল অচল তারা অসৎশূদ্র। তারা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, ঘৃণার পাত্র।

সৎ শূদ্র - নবশাক - নবশায়ক - নতুন তৈরি শাখাবৃত্তি ভিত্তিক — যে যার বৃত্তি নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়। অসৎ শূদ্র — জল-অচল অর্থাৎ উপেক্ষিত, সমাজ জীবনে এরা অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। অতএব সমগ্র সমাজের ঘৃণাই এদের প্রাপ্য। সমাজ জীবনে জল-অচল শব্দটাই যেন ঘৃণার চরম প্রকাশ, এবং সমাজমান্য। নিজেদের তখন অনেক উঁচু আর বড়ো পবিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু জল-অচল প্রথা হিন্দু বা ব্রাহ্মণের উদ্ভাবিত বা একচেটিয়া নয়। শুনতে অবাক লাগে, এই বঙ্গদেশেই কোনো মানবগোষ্ঠীর কাছে খোদ ব্রাহ্মণরাই জল-অচল সম্প্রদায়। এই বিংশ শতাব্দীতেও। তারা হচ্ছে সাঁওতাল।

> ''কোন সাঁওতাল অদ্যাবধি কোন ব্রাহ্মণের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণকে অপবিত্র কাজ বলে মনে করেন। ব্রাহ্মণদের তাঁরা শয়তানের প্রতিভূ বলে মনে করেন। খাদ্য তো দূরের কথা সাঁওতাল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের গৃহে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। কুর্মীদের মহিলারা এখনও ব্রাহ্মণের ছোঁওয়া খাবার খান না।''[২]

সাঁওতাল সমাজ আজও শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসাবে টিকে আছে বলেই তাঁদের এই মানসিকতা জানা সম্ভব হয়েছে। তুচ্ছ করার কারণ নেই। জল-অচল ব্যাপারটার একটা তাৎপর্য বোধহয় মিলছে। কারও কাছে কেউ জল-অচল হলেই সে সর্বজনস্বীকৃত ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অন্ত্যজ হয়ে যায় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বৈরিতা-ই জল-অচল ঘোষণার উৎস। স্বার্থের সংঘাত এনেছে অবিশ্বাস ঘৃণা-বৈরিতা। তা থেকেই সম্পর্কহীনতার ঘোষণা — জল-অচল। অর্থাৎ ওরা অনাত্মীয় - অবিশ্বাসী।

বাগ্দী, বাউরি, ডোম, মল্ল — বাঙলার আদিবাসী গোষ্ঠীর শরীক। আর্য অনুপ্রবেশকে এরা বাধা দিয়েছে যথাসাধ্য। স্বাধীনতা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছে। যতকাল পেরেছে, প্রতিহত করেছে বিদেশী শক্তিকে। সৃষ্টি হয়েছে বৈরিতা। হয়তো এদের কাছেও তখন ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছিল জল-অচল সম্প্রদায়। আর্যদের লিখিত সাহিত্য আছে, শাস্ত্র আছে। এদের তা ছিল না। তাই অতীত কথা ধরা নেই। ছড়া গানে, লোককথাময় যদি থেকেও থাকে, কোথায় হারিয়ে গিয়েছে সে সব। সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নি। ফলে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের, এমনকি চৈতন্য যুগের বাঙলার জন সমাজের স্পষ্ট চিত্রই কি মেলে? মনে হয়, তখন বাঙলার জন গোষ্ঠীর সবই ছিল হয় হিন্দু না হয় বৌদ্ধ। প্রকৃতই কি তা ছিল? বাগ্দী বাউরি ডোম কি হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিল?

বাঙলার আদি গোষ্ঠীর সম্মানিত ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধারা

শেষ অবধি হিন্দু সমাজ প্রান্তে নিরুপায় আশ্রয়প্রার্থী। তাই তারা জল-অচল। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য, অসৎ শূদ্র, হীন মূর্খ, দরিদ্র, অন্তবাসী।

জল-অচল তারাই উচ্চবর্ণের মানুষের জীবন-যাপনে যারা অপরিহার্য নয়। এরা ছাড়া জল-অচল সম্প্রদায় ছিল।

প্রাক স্বাধীনতা কালে নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলেই দেখা যেত, হিন্দু সমাজভুক্ত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই অবজ্ঞার পাত্র ছিল, — যুগী (যোগী) সুবর্ণবণিক আর বৈশ্য। লোকে বলত, ওরা নিচু, ওদের জল খেতে নেই। সুবর্ণবণিকদের প্রতি অবজ্ঞা ছিল প্রবল। সেটা কত দূর তা বোঝা যায় একটি প্রচলিত ধারণা থেকে।

ইলিশ মাছ কাটা হলে, তার কণ্ঠ থেকে সাদা সরু চালের মতো একটা কাটা হাড় বার হত। সেটা দেখিয়ে বাড়ির ঠাকমা দিদিমা স্তরের প্রবীণা মহিলা বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের বলত, এই দ্যাখ এটা সোনার বেনের বাড়ির ভাত। মাছটা আগের জন্মে বামুন ছিল। সোনার বেনের বাড়ির ভাত খেয়েছিল। সে ভাত আর গলা থেকে পেটে নামে নি। মাছ হয়ে জন্মেছে। ভাত গলায় আটকে আছে। মাছের একটা সরু নাড়ী বার করে বলত, এটা বামুনের পৈতে। খা সোনার বেনের বাড়ির ভাত।

ঘৃণা কুৎসা ছড়ানো হয়েছে কত সুকৌশলে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। সুবর্ণবণিকের বাড়িতে ব্রাহ্মণের ভাত খাওয়া নিয়ে এমন প্রচারের উৎস কী? এবং স্বতঃই যে উত্তর মনে আসে, তা হচ্ছে, উদ্ধারণ দত্তর বাড়িতে নিত্যানন্দর ওঠাবসা এবং অগ্রগ্রহণই এই অপপ্রচারের উৎস। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ পুরীতে শ্রীচৈতন্যর কাছে নালিশ জানিয়ে কৃতকার্য না হওয়ায় নিজেদের নীতিকে বজায় রাখতে বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে এই কুসংস্কারকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এত মাছ থাকতে ইলিশকে সেই অপরাধী ব্রাহ্মণ ধরা হল কেন? এ বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে যে আর্য ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ এবং বঙ্গদেশে বহিরাগত, তাই সাদা এবং বহিরাগত ইলিশই তার প্রতীক হয়েছে? ইলিশকে খালে বিলে পুকুরে পাওয়া যায় না। মূলত সামুদ্রিক মাছ তাই দেশজ নয়। বহিরাগত এবং বিশিষ্ট। যাই হোক, একেও বলা যাবে বৈরিতার ছোবল। কারণ, বৈশ্য যুগী আর সুবর্ণ-বণিক কেউই হিন্দু, হিন্দু সমাজভুক্ত সম্প্রদায় ছিল না। বৈশ্য এবং সুবর্ণবণিক শ্রেষ্ঠী সমাজ ছিল বৌদ্ধ। সে সমাজে তাঁরা ছিলেন বিশেষ সম্মানিত। এদের ওপর ভর দিয়েই বৌদ্ধ সমাজ সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্ত উড়েছিল।

বৌদ্ধ শক্তির অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আঘাত হানতেই এদের প্রতি এত বৈরীভাব পোষণ। যুগীরা তো নাথ যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত, বর্ণাশ্রম বিরোধীগোষ্ঠী। শিক্ষায় জ্ঞানে কার্মে এঁরা ছিলেন উচ্চবর্গীয়। এঁরা কেউই বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন নি। তাই বর্ণাশ্রমী হিন্দুর কাছে এঁরা ছিলেন জল-অচল, অবজ্ঞার পাত্র। চৈতন্যর সময়েও সুবর্ণবণিক আর বৈশ্যরা বৌদ্ধ ছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত বৌদ্ধ থেকেই বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তাই আবার বলতে হয়, জল-অচল, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বলে যে সামাজিক ঘৃণা সমাজচল হয়ে জনমনে দৃঢ়মূল হয়েছে, তা কিন্তু নিতান্তই প্রতিহিংসা-জাত।

চৈতন্যর সময় এই সামাজিক সংকট প্রবল ছিল। মীমাংসা হয় নি বহু সামাজিক সমস্যার। ব্রাহ্মণ সমাজ কূর্ম বৃত্তি অবলম্বন করে আছে। বৌদ্ধ সমাজ ছত্রভঙ্গ। তাদের রাজা নেই। জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজ দেশত্যাগী। পলাতক। বিহার সঙ্ঘাবাস পরিত্যক্ত, শূন্য, কোথাও আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত। গৃহস্থ বৌদ্ধরা বিপন্ন। ধর্মত্যাগ সহজ নয়। ধর্মত্যাগ করে হিন্দু হলে তো নিষ্কৃতে, ঘৃণার আসনে বসিয়ে দেবে। তারা দ্বিধান্বিত। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় দিশেহারা।

অন্যদিকে মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা সক্রিয়।

এই পরিবেশেই গৌরাঙ্গদেব ভক্তি প্রচারক। সকলকে প্রেম সুখে ভাসাবেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকারের মতে:

> ''Chaitany's Vaishnava cult was one of the 'Aryan' rivals to Islam in the matter of making converts from Non - Hindu and Non - Buddists in medieval Bengal''

মনীষী বিনয় সরকার এখানে একটি বিশেষ মত প্রকাশ করেছেন যে সে সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনোটাই ছিল না। ছিল এদের বাইরে নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে। ইসলাম প্রচারকেরা তাদেরই ধর্মান্তরিত করছিলেন। চৈতন্যর উদ্দেশ্য ছিল তাদের হিন্দু সমাজভুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব আন্দোলন। তাই তিনি ইসলাম প্রচারকদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাহলে বিনয় সরকারও বলছেন, চৈতন্য আন্দোলন উদ্দেশ্যমূলক ছিল।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বারংবার উল্লেখিত নীচ শূদ্র অধম পতিত। এগুলি তৎকালীন সমাজজল শব্দ। আদি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের প্রতি ঘৃণার্থে প্রযুক্ত হত। আর্যরা আগে এদের বলতেন, পক্ষী, কাক, পায়রা, অসুর। বঙ্গদেশ বিজয়ের

পর তারা হয়েছে অধম, পতিত, নীচ। চৈতন্যর সেই পতিতদের উদ্ধার করার আন্দোলন। এটাই আর্যেতরদের আর্যকরণ প্রয়াস। সেই সঙ্গে সকলকে নিয়ে সুসংহত সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন।

হরিভক্তি বিলাস সে সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তাই চৈতন্য অনুসারী না বলে বৃন্দাবনের গোস্বামী নির্দেশিত সম্প্রদায় বলাই বোধ হয় শ্রেয়।

(ক্রমশ)

গ্রন্থপঞ্জী

১ - ৪. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর : *চৈতন্য ভাগবত*
৫. রমাকান্ত চক্রবর্তী : *বারোমাস - এপ্রিল ১৯৮৬ চৈতন্যের ধর্মান্দোলন*
৬. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর : *চৈতন্য ভাগবত*
৭. লোচন দাস : *চৈতন্য মঙ্গল*
৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী : *বারোমাস - এপ্রিল ১৯৮৬*
৯. ড: বিনয় কুমার মাহাত : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড *নবপত্র প্রকাশন*
১০. Benoy Kumar Sarkar : *Krishnagar College Centinary commemoration volumes.*

লেখক পরিচিতি

অজিত দাস এর জন্ম ১৯২৮ সালে, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। লেখাপড়া কৃষ্ণনগর কলেজেই। পেশায় শিক্ষক। সমাজ বিষয়ক গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রমী। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদিও লিখে থাকেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : *সামুদ্রিক, ভাগফল, ক্রৌঞ্চনিষাদ, অজ্ঞাতবাস ও অন্যান্য গল্প* ইত্যাদি।

গ্রন্থ সমালোচনা

সৈয়দ মুজতবা আলীকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গবেষণাকর্ম

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কিছু কিছু গ্রন্থ আছে যা হাতে আসা মাত্রই পড়ে শেষ করা যায় না। এক অতি সতর্ক ধীর অভিনিবেশে এর প্রতিটি ছত্রের অন্তর্গত বিন্যাস ও বক্তব্যকে লক্ষ করতে হয়। কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণে প্রবেশ করার আগে নিজস্তরেই দাবি করে নেয় একাধিক পাঠ — নূরুর রহমান খানের গবেষণার ফলশ্রুতি *সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকথা* ও *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী* পরিপূরক গ্রন্থদুটিও তেমনি এক বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য রচনা। প্রথমটির জন্য লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. পেয়েছেন, দ্বিতীয়টি তাঁকে এনে দিয়েছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট সম্মান *''সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনকথার''* প্রকাশক ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি। *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র ও রচনাশৈলী* ঢাকার বাংলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।

একই সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্যে ঠাসা দুটি গ্রন্থে যার মোট আয়তন একুনে এক হাজার বারো পাতা পড়ে ওঠা সহজ কর্ম নয়, পড়লেও তথাকথিত আলোচনা বা সমালোচনার আলোকে তাকে দেখানো দুরূহ কর্ম। বিশেষত আমার পক্ষে যে আমি মুজতবার জীবনের শেষ কটি বছরের সাহিত্যকর্ম ও দিনগুজরানোর সঙ্গে ছিলাম প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যতখানি দূরত্বের ধ্যানে দেখলে দেখার দিগন্ত বিস্তৃত হয়, আমার অতি কাছের এবং অশেষ ভালোলাগার মানুষটিকে আমি কখনই ততটা দূরত্বে নিরীক্ষণ করতে পারব বলে মনে করি না। ফলে এ আলোচনা এক মহান পণ্ডিতের ওপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকর্মের যোগ্য বিশ্লেষণ যে হবে না, এই নান্দীপাঠটুকু প্রথমেই করে নিতে চাই। আরেকটি কথা, রম্যরচনাকার হিসাবেই তিনি মূলত সার্থক, বা উপন্যাসে তাঁর তেমন স্ফূর্তি ঘটে নি — এ ধরনের আলোচনায় প্রবেশ করাও গবেষণাগ্রন্থ আলোচনায় অসমীচীন। তাই সে ধরনের বিতর্কবিনীত প্রসঙ্গও টেনে আনব না।

মুজতবার লেখা পড়েন নি, এমন বাঙালি পাঠক নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়, কিন্তু তাঁর বর্ণময় জীবনী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে এমন বাঙালি এপার বা ওপার বাঙলায় খুব বেশি আছেন বলে মনে হয় না। সেই জীবনকথা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে একত্রিত হয়েছে *সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকথায়*। যদিও মুজতবা নিজে আমাকে তাঁর শৈশব কৈশোর সম্পর্কে যা কিছু জানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের কিছু কিছু অমিল রয়েছে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, সূর্যোদয়ই যেখানে প্রধান দ্রষ্টব্য, সেখানে কাকপাখির সঙ্গে অন্য দুএকটি পাখি উদয়কালে ডেকেছিল কি ডাকে নি সেটা কোন আলোচনার বিষয়ই হতে পারে বলে আমি মনে করি না। জীবনীগ্রন্থটিতে সৈয়দদার বাল্য থেকে প্রৌঢ় বয়স অবধি যে মানবজীবন তার বহু অজানা ও এতাবৎকালের অনাবিকৃত দিক লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। যারা মুজতবাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে চান এই জীবনীগ্রন্থের সামনে প্রথমেই এসে দাঁড়ানোটা তাদের পক্ষে লাভজনক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। জীবিতকালে মুজতবা নিজে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনপ্রকার আলোচনা পছন্দ করতেন না। তাঁর যত কৌতুক, মস্করা, গুরুগম্ভীর আলোচনা, সবই করতেন নিজের খরচে। বলা বাহুল্য ''নিজের খরচ'' বাক্যবন্ধটি ইংরেজি ''এট ওউন কস্ট'' অর্থে ব্যবহৃত হল। হাসতে হাসতে পাঠককে কাঁদানো বা অশ্রু ঝরে পরার মুহূর্তে তাকে মস্করার বাতাসে উড়িয়ে দেয়া — উভয়ক্ষেত্রেই মুজতবা ছিলেন তুলনারহিত। পণ্ডিত তিনি ছিলেন ঠিকই তবে তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে সর্বপ্রকার আলোচনাকে কৌতুকের এক জোরালো ফুঁয়ে সবসময় নিভিয়ে দিতেন। নিজের খরচে কৌতুক করার একটি নিদর্শন জীবনীগ্রন্থ থেকে মুজতবার নিজের বয়ানে তুলে দিচ্ছি, পাঠশালায় প্রথম প্রবেশের দিনটি বর্ণনায় ''আমার কণ্ঠস্বর শুনেই গুরু বুঝে গেলেন এটা একেবারে জাত দাঁড়কাকের। সবিস্ময়ে দাদাকে শুধোলেন — এটা তোর ভাই! তারপর গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'কস্মিন কালেও শুনিনি কাক কোকিলের বাসায় ডিম পাড়লো। এইবার একটা ব্যত্যয় দেখলাম। হরি হে তুমিই সত্য'।'' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার মুজতবাকে লিখেছিলেন, ''দেশ পত্রিকায় অনেকদিন আপনার লেখা নেই, তাই ঐ পত্রিকার স্বাদ আজকাল আমার কাছে জলো

লাগে''। এর উত্তরে মুজতবা খানিকটা ইচ্ছাকৃত গুরুচণ্ডালীতে জানালেন ''আপনি যখন আপনার naif সরলতায় বলো আমার লেখা না থাকলে ''দেশ'' (সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা) ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, তখন বলতে ইচ্ছা করে — হাসান্‌নি রে ছোঁড়া হাসান্‌নি — বগল ঘামিয়ে হাসান্‌নি''। কেউ তাকে জ্ঞানী পণ্ডিত বললে কি নিরভিমান উচ্চারণে বলেন ''জানেন মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি, সে ভাবছে আমি জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন কসম খেয়ে বলছি জ্ঞান যৎসামান্য একটু একটু হয়তো মাঝে মাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি ওটা আমার নেশা, নেশা, নেশা।'' তাঁর নানা বিদেশী ভাষাজ্ঞানোর সপ্রশংস উল্লেখের উত্তরে লেখেন তিনি ছ-সাতটা ভাষা ''misunderstand'' করতে পারেন।

এই জীবনী গ্রন্থ থেকেই প্রথম আমরা জানতে পারি স্কুল শিক্ষায় বীতস্পৃহ বা স্কুল পরিত্যক্ত কিশোর মুজতবাকে রবীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনে উৎসাহের চিঠি লিখে নিয়ে আসেন। স্কুলের পড়া ছেড়েছিলেন গান্ধীজীর আহ্বানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন আন্দোলনে সাড়া দিয়ে। চোদ্দ বছরেই পড়ার পাঠ চুকিয়ে দেয়া মুজতবা বিশ্বভারতীতে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সে সময় বিশ্বভারতীতে কোন প্রচলিত ধারার পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সৈয়দদা লিখেছেন ''Having failed at all examinations, so far, I was naturally delighted to join an institution where was no nightmare of examinations.''

নুরুর রহমানকে আরেকটি কারণেও ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি মুজতবা জীবনের তথ্যপঞ্জী সংগ্রহে অকল্পনীয় পরিশ্রমই শুধু করেন নি, কিছু কিছু সংঘটন অপ্রিয় হলেও উপস্থাপনে সাহসিকতা দেখিয়েছেন। আমরা জানি কোন চাকরিই মুজতবাকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে নি। আসলে নিয়মবিনীত চাকরি করার মানসিকতাই তাঁর ছিল না। একমাত্র শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর গবেষক-অধ্যাপকের কর্মটিই তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে করেছিলেন। কৈশোর-যৌবনের উপবন বিশ্বভারতী তাঁর বার্ধক্যের বারানসী হোক এটা তিনি মনেপ্রাণেই চেয়েছিলেন। যখন নিতান্তই নিয়মগত কারণে তাঁকে তাঁর অধ্যাপনার চাকরিতে আর extension দেওয়া হল না, তখন বিশ্বভারতী ত্যাগের প্রাক্কালে গভীর মনোবেদনায় বন্ধু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখেন ''I am leaving . Now either I will hear your are dead or you will hear I am dead.'' শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে জানালেন ''আমি জীবনে আর শান্তিনিকেতনে যাবোনা''। মনে পড়ছে তখন তিনি বিশ্বভারতীর এলাকার অনেক বাইরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে একলা বাস করছেন (সম্ভবত ১৯৫১ সালের পৌষমেলায়) আমি কালোয় দোকানে চায়ের আড্ডায় প্রশ্ন করেছিলাম ''কেমন দেখছেন শান্তিনিকেতন?'' ঋটিতি সৈয়দদার উত্তর ''হ্যাঁ নিকেতন তো বেশ ভাল হারেই বাড়ছে ভায়া, এখন শান্তিটুকু থাকলেই হয়''।

''দেশে বিদেশে'' মুজতবাকে প্রথম সাহিত্যিক পরিচিতি দিলেও শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায়ই মুজতবার লেখকজীবনের হাতেখড়ি এবং তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই প্রত্যক্ষ উৎসাহে। মুজতবার জবানীতে '' আমার বয়স যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপতে আরম্ভ কর। আর দেখ্, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস ব্যবস্থা করবো'।'' কিন্তু পরবর্তী কালে বহুদিন আমরা তাঁর কোন লেখা পাই নি। সম্ভবত মুজতবাই ''ব্যবস্থা'' ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখান নি। ''দেশে বিদেশে'' রচনাটি শুরু করার মূলেও একটি বিশেষ কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল। কেউ কেউ জানেন, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকেরই সে ইতিহাস অজ্ঞাত। এই রচনার পেছনে ছিল আলী সাহেবের প্রাণপ্রিয় অগ্রজকন্যা জাহানারার উস্কানি। দুচোখের মণি এই প্রাণোচ্ছল কিশোরীটি ছিল মুজতবা অস্তিত্বের অনেকখানি জুড়ে। ''দেশে বিদেশে'' সম্পর্কে বাকিটুকু লেখকের মুখেই শোনা যাক — ''আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান আমার বড় দাদার বড় মেয়ে জাহানারা একাধিকবার বাঙ্গ করে বলেছে — হি! ছোট চাচার শুধু মুখে মুখে হাইজাম্প আর লঙ জাম্প! একখানা বই লিখে দেখান না, আপনি কিছু একটা করতে পারেন? আমার তখন বড্ডই গোশসা হতো। তদুপরি অর্থকৃচ্ছতা। তখন গত্যন্তর না পেয়ে লিখলুম ''দেশে বিদেশে''। এই অসামান্য গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চিত লক্ষ করেছেন এটি জিন্নাত-নিবাসিনী অগ্রজকন্যা জাহানারাকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। বইটির প্রকাশের আগেই আকস্মিক জাহাজডুবিতে জাহানারার অকালমৃত্যু ঘটে।

সাহিত্য রচয়িতাকে তাঁর জীবনীকথায় পুরোপুরি পাওয়া যায় না। সাহিত্যই সেই অনিবার্য নিরিখ, যেখানে লেখক তাঁর পরিপূর্ণ বিস্তার নিয়ে, ধ্যানধারণা নিয়ে ছত্রে ছত্রে উপস্থিত থাকেন। তাই নুরুর রহমান এই পর্যায়ের পরিপূরক

দ্বিতীয় গবেষণাগ্রন্থ *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র ও রচনাশৈলী* রচনা করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে। যিনি একছত্র মুজতবা পড়েন নি (জানি না তেমন কোন বাঙালি পাঠক আদৌ থাকা সম্ভব কিনা!) তিনিও এই গবেষণাগ্রন্থটি পাঠ করে সৈয়দ মুজতবা আলীর সমগ্র সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণায় দীপ্ত হবেন। এবং তারপর সম্পূর্ণাকারে প্রতিটি গ্রন্থ আলাদা আলাদা ভাবে না পড়ে পাঠকের আর উপায় থাকবে না বলেই বিশ্বাস। মুজতবা বিরচিত প্রায় প্রতিটি রচনার আনুপূর্বিক বিচার বিশ্লেষণ রয়েছে এখানে।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করেছেন পি. এইচ. ডি এবং ডি. লিট প্রাপ্ত গ্রন্থের যে ধরন ভারী স্থিতধী আলোচনা করা প্রয়োজন, আমি একেবারেই সে ধরন কেতাবী রচনা লিখছি না,তাছাড়া গবেষণাকর্মের তথ্যনির্দেশে দু-একটি যায়গায় আমার নাম ও মৎ সম্পাদিত সাহিত্যপত্র ''বিভাবরে'' নাম উল্লেখ রয়েছে, ফলে আমি কিছুতেই ততটা নিরাসক্তির দূরত্বে পৌঁছতে পারছি না যতখানি দূরে গেলে আমি আমার আলোচনার দিগন্তকে একাডেমিক অর্থে আর একটু বিস্তৃত করে দেখাতে পারতাম। তবু দু-একটি বিষয়ে জনাব নুরুর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত মনে হচ্ছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যখন মুজতবার পাশে অন্যান্য লেখকদের এনে বসিয়েছেন তখন তার ব্যক্তিগত ভালোলাগার ভাষা কিছুটা অতিমাত্রিক। দুটি গ্রন্থের সাকুল্যে এক হাজার বারো পাতার এই মহৎ পরিশ্রমটি আমাদের আদ্যপ্রান্ত আবিষ্ট করে রাখলেও লেখকের নিজস্ব সমস্ত মনোদর্শনই অপরিহার্য ছিল না। ''দেশে বিদেশে''-কে বিদগ্ধজনেরা নাকি শেষ অবধি ভ্রমণ-সাহিত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। ''যে গ্রন্থটিকে আশ্রয় করে সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙলা সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসনের দাবীদার, তার শ্রেণী-প্রকৃতি সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকলেও বিদ্বজ্জন এটিকে ভ্রমণ-সাহিত্য হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।'' এখানে একদিকে ''মতদ্বৈত'' অন্যদিকে ভ্রমণ-সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ'' একটু পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না কি! তাছাড়া গ্রন্থটি তো ক্রমপর্যটনের সঙ্গে সঙ্গে লেখা কোন রোজনামচা তো নয়। ''দেশে বিদেশে'' কে ভ্রমণকাহিনী গণ্য করে তিনি ভারতীয় ভ্রমণকাহিনীগুলির (ভ্রমণসাহিত্যের নয়!) আদিতে পৌঁছতে চেয়ে চৈতন্যদেব অবধি পেছিয়ে গেছেন। এর নিশ্চিত কোনো আত্যন্তিক প্রয়োজন ছিল না। চৈতন্য প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, বিশেষ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত দেশ পর্যটনের সঠিক বৃত্তান্ত বলে গণ্য করা একেবারেই অনুচিত। প্রথমত চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ পরিকর ও অনুচরদের কাছ থেকে শুনে লেখা। দ্বিতীয়ত গ্রন্থটিতে কিছু মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই পারম্পর্যহীন এবং সে কারণেই শতকরা একশোভাগ নির্ভরযোগ্য নয়। দু-একটি ক্ষেত্রের বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া এদের সাহিত্য পদবাচ্য গণ্য করার কোন কারণ নেই। ''দেশে বিদেশে'' কিন্তু পুরোপুরি সাহিত্য এবং লেখকের নিজের লেখা, এতে ভ্রমণ উপলক্ষ হলেও প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা ভ্রমণবৃত্তান্ত বলি তা কিন্তু নেই। একজন ভ্রমণ করলেন, সে বিষয়ে বহুপরে একাধিক অন্যজনে তা লিখলেন, অপর দিকে মুজতবা নিজেই লিখেছেন নিজের কথা। সুতরাং এ প্রসঙ্গে অন্য ভ্রমণকাহিনী টেনে আনার প্রশ্নই আসে না।

সম্ভবত মুজতবাও নিজেও একে ভ্রমণকাহিনী অভিধার অন্তর্গত হতে দিতে রাজী হতেন না। নিজের ডাইরীতে জ্যেষ্ঠপুত্রের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন '' আমার একটা বইয়ের নাম ''দেশে বিদেশে''। বাংলায় ইডিয়ম ''দেশে বিদেশে'' অর্থাৎ সর্বত্র অর্থাৎ 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে'। আমি কিন্তু 'দেশে বিদেশে' শব্দার্থে লিখেছি।'' আসলে ''দেশে বিদেশে'' যতটা বহির্ভ্রমণ তার অনেক অনেক বেশি মনোভ্রমণ। ভাষার প্রসঙ্গ এলে, বলতেই হবে গবেষণাকর্ম দুটির ভাষা সবসময় সংগতিপূর্ণ থাকে নি। কিছু কিছু পঙ্‌ক্তির গঠনও বক্তব্যকে সাহায্য করে নি। নুরুর সাহেব প্রথমেই লিখেছেন ''কবি নজরুলের পর উভয় বঙ্গে সমান সমাদৃত লেখক নিঃসন্দেহে সৈয়দ মুজতবা আলী''। সম্ভবত উনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী লেখকদের কথা মনে রেখেই লিখেছেন। না হলে এ উক্তির কোন অর্থ দাঁড়ায় না। সাহিত্য যেখানে আলোচ্য সেখানে ধর্মাধর্ম নিতান্তই গৌণ ব্যাপার।

তবু এই বইটি হাতে পেয়ে বহুদিন পর আমি আমার হারানো এক অতি প্রিয় আপনজনকে ফিরে পাবার আনন্দে ময় হতে পেরেছিলাম। এর মূল্যও বড়ো কম নয়। যে লেখক অসামান্য প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে কখনই তেমন ভাবে তুলে ধরতে চান নি। প্রচলিত পাণ্ডিত্যের প্রতি যার চিরকাল ছিল প্রবল বিতৃষ্ণা (''জানেন মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি, সে ভাবছে আমি জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুব দিচ্ছি''!) তিনি যদি এই মুহূর্তে জীবিত থাকতেন তাহলে নুরুর সাহেবকে কি

ধরন পঞ্চতন্ত্রের তাত্ত্বিক করতে চাইতেন সেটার অনুমানের অনিশ্চয়তাতেই তোলা থাক। তবে মুজতবার ওপর প্রথম অথচ প্রায় সবাঙ্গ সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভদুটি প্রকাশ করে তিনি সমগ্র বাঙালি পাঠককে ঋণী করে রাখলেন।

মুজতবা সত্যিই কত বড়ো লেখক ছিলেন রম্যরচনাগুলি ছাড়া উপন্যাসে, শিশুসাহিত্যরচনায় তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি কতটুকু আজ তার আলোচনা করে আর লাভ নেই। তবু নূরুর রহমান খানের এই বইদুটি ভবিষ্যতের মুজতবা গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবেই। একই সঙ্গে লেখকের জীবনী ও সাহিত্যজবানীর এমন মনিকাঞ্চনযোগ প্রত্যক্ষ করা সত্যিই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

আয়তনের তুলনায় গ্রন্থদুটির দাম প্রায় আঁৎকে ওঠার মতো। *সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকথা*গ্রন্থের মূল্য ২১৫ টাকা। *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী*-র দাম ১৯০ টাকা। প্রথমটির প্রকাশক এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা। দ্বিতীয়টির প্রকাশক বাংলা একাডেমী ঢাকা।

মাফরুহা চৌধুরীর গল্প ও উপন্যাস

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে নিই, আমি পশ্চিমবাঙলার লোক। দেশবিভাগের আগে বা পরে কখনোই পূর্ববাঙলা দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নি। উপরন্তু, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। শুনতে পাই, বাঙলাদেশ গঠিত হবার পর, গত কুড়ি বছরে ওখানে জাতীয় ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যা ঈর্ষণীয়। কিন্তু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার আদানপ্রদান আজও অবাধ হল না, সুতরাং দুই বাঙলার মিলিত অগ্রগতি আমাদের আয়ত্তের বাইরে। আমার সৌভাগ্য, বাঙলাদেশের কয়েকজন প্রসিদ্ধ এবং কয়েকজন তরুণ কবি আমার বন্ধুস্থানীয়। তাঁদের লেখালেখির সঙ্গে আমি পরিচিত। তাঁরা কলকাতায় এলে আড্ডা, মেলামেশা হয়। বাঙলাদেশের পাঠক এদিককার সাম্প্রতিক সাহিত্যকে কী চোখে দেখেন, আমি জানি না, তবে এ-ও শুনতে পাই যে, কলকাতার জনপ্রিয় লেখকদের বই ওদিকে খুব চলে, অবৈধভাবে মুদ্রিতও হয় চাহিদা মেটাতে হয়। তা যদি সত্য হয়, তবে বলব, পাঠকের আসল টান সাহিত্যের রসের ওপর নয়, এই মহানগরের জীবন ও তার বৈচিত্র্যের দিকে। হয়তো কলকাতার কথ্য বাংলাভাষার দিকেও খানিকটা। এদিককার গল্প উপন্যাস কলকাতার একঘরনের সাবলীন কথ্যভাষায় লিখিত হচ্ছে যদিও লেখকেরা অনেকে পূর্ববঙ্গ-উদ্ভূত।

বাংলাদেশের প্রচলিত গদ্য একটু আলাদা রকমের, মাফরুহা চৌধুরীর নিবাচিত গল্প ও উপন্যাস পড়তে গিয়ে টের পেলাম, যেমন আইরিশ বা স্কটিশদের ইংরেজি। পালিশ হয়তো একটু কম কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। চরিত্রপাত্রদের স্পর্শ করা যায়। তারা জলকে অনেক সময় পানি বলে, জলখাবারকে নাশতা, তাদের সংলাপের ক্রিয়াপদে বাঙাল-টান এক-এক সময় দুর্বোধ্য; তবু ওরা যে আমাদের বাঙলাভাষাভাষী আত্মীয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওদের সমস্যাগুলির রকম আর মোকাবিলার ধরন দেখে। চরিত্রগুলি সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে আছে, মূলত গ্রামাঞ্চলে, শহরে চাকচিক্যে তাদের স্পৃহা কম।

নিবাচিত গল্পের ভূমিকায় হোসেনউদ্দীন হোসেন বলেছেন, মাফরুহা চৌধুরীর গল্পের সৃষ্ট চরিত্র অধিকাংশই বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আহত পাখির মতো যন্ত্রণায় দগ্ধ ক্লান্ত ও বিষণ্ন। সেখানে মানবাত্মার রক্তক্ষরণ ও ক্রন্দনের হাহাকার মূর্ত। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও লেখনী ক্ষুরধার। আরো অনেক কথা বলেছেন, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি একজন পরিণত লেখক (লেখিকা বলতে চাই না), সাহিত্য ও জীবনের শিল্পী। তাঁর কাহিনীসূত্র নিবাচনে কোথাও আড়ষ্টতা বা পক্ষপাত নেই — সেইটেই আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বোধ হয়েছে। এমন কী, পুরুষশাসিত সমাজে নারীজাতির হীন অবস্থান বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন দেখি না। খুব কাছ থেকে, ভেতর থেকে তিনি তাঁর দেশের সমস্ত মানুষের অন্তর ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে। মাফরুহা চৌধুরী যে বড়োমাপের লেখক, তাঁর গল্প বলার নিরাসক্ত ভঙ্গি ও চমক সৃষ্টির ব্যাপারে অনিচ্ছা তা প্রমাণিত করে।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তার বয়েসও কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনুন্নত ও জনবহুল দেশের পক্ষে যা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ ও হতাশা, একশ্রেণীর মানুষের সমৃদ্ধি, ক্ষমতালোলুপ রাজনীতির পরাক্রম তার অভিজ্ঞতা হয়েছে দেশবাসীর। মাফরুহা চৌধুরীর একাধিক গল্পে এই সমস্যার উপযুক্ত বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে দেখতে পাই। যেমন 'নিহত যাম বিদীর্ণ প্রহর' গল্পে পাকিস্তানীদের নির্যাতন, ভয়, একদল নারীর বন্দিত্ব। 'আমরা তিন বন্ধু' গল্পে একদা মুক্তিযোদ্ধার অমানুষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। 'দাও হাত ধরি' গল্পে পরবর্তী প্রজন্মের সম্মুখীন বিপর্যস্ত কায়েস চৌধুরী, যে রুগ্‌ণ বিবর্ণ স্ত্রী আর পুত্রের ফোটোগ্রাফ প্রবাসী আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে অর্থসাহায্যে আনে, তার তিক্ততা। খেদ।

সমকালের নৈরাশ্য বয়স্ক মানুষকে স্বাভাবিকভাবে অতীত জীবনের স্মৃতিচারণে ঠেলে দেয়। শহুরে মানুষকে মনে করিয়ে দেয় সরল গ্রাম বাংলার জীবন। তখনও দারিদ্র্য ছিল কিন্তু শোষণের এত বীভৎসতা ছিল না। 'দেয়াল' আর 'চিত্তবনে বাঁশি বাজে' এইসব চিন্তাভাবনার প্রতিনিধি। সেই সঙ্গে মানবিক আবদনের প্রলেপ রয়েছে। পানের বরজকে কেন্দ্র করে আর একটি গল্প 'অরণ্য গাথা' এক মধুর মিথ সৃষ্টি করে।

মাধুর্য, তিক্ততা, আশাভঙ্গ নিয়েই কেবল কাজ করেন নি লেখক। বর্তমান অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দুটি দরিদ্র বালকের আচরণে এমন চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন 'আবার কাক' আর 'বাড়ি ঘর' গল্পে যে, মনে হয়, তিনি যেন, সেই নিঃস্ব সমাজেরই একজন। তাঁর কোনো রচনাতে বিশ্বাসযোগ্যতা আহত হয় না। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে লেখা 'চন্দন' ও 'ক্যান্সার' আমার ভালো লেগেছে।

নিবাচিত গল্পের সূচীপত্র একটু এলোমেলো। ভূমিকায় প্রশংসিত দুটি লেখা 'ছায়াপথের মানচিত্র' ও 'কেউ হয়' বইতে নেই। বইতে আছে অথচ সূচীপত্রে অনুপস্থিত আর দুটি গল্প 'সতর্ক থাকবো' এবং 'কোথাও ঝড়', সেই সঙ্গে আর একটি গল্প 'প্রকৃতি সংলগ্ন' ব্যক্তিগত সম্পর্কের এমন কয়েকটি স্তর উন্মোচিত করেছে যা বাঙলা গল্পে বিরল।

পুব বাঙলার আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ আমার কাছে কিঞ্চিৎ খটোমটো ঠেকলেও অস্বাভাবিক লাগে নি। খাপছাড়া লাগল যত্রতত্র ইংরেজি শব্দের ব্যবহার।

এবার উপন্যাসটি সম্পর্কে দুচার কথা বলি।

দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন কিন্তু ১৯৯১ সালে প্রকাশিত 'এক নয় সাত এক' নামক উপন্যাসটি লেখকের প্রথম। তাঁর নিজের কথায়, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এর উপজীব্য', তবে এই রচনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা নেই, উপন্যাসের সংবেদনই মুখ্য। মাফরুহা চৌধুরী নিজে ইতিহাস-পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সমকালীন ভক্ত ও সমালোচক।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, তাঁর ছোটগল্পে আমি যে মুন্সিয়ানা লক্ষ করেছি, উপন্যাসটিতে তা অনুপস্থিত। একটি সংকটকালের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লেখক নিজেই ভাবাবেগে খানিকটা জড়িয়ে পড়েছেন। উপন্যাসটির কাঠামো দেখে গ্রাহ্যম গ্রীন রচিত 'দি কোয়ায়েট আমেরিকান' বইটির কথা মনে পড়ে, যা ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা কিন্তু ঘটনা উপস্থাপনের নিরাসক্ত ভঙ্গীটি এতে নেই। যা আছে, তা হল একটি পারিবারিক কেন্দ্রবিন্দু — সাজ্জাদ সাহেব ও মিনারার সম্পন্ন পরিবার যার ওপর মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন উত্তেজক সংবাদ এসে আছড়ে পড়ছে। যুদ্ধে জড়িত চরিত্রপাত্রদের মুখে আমরা সংবাদগুলি অবগত হচ্ছি, যে যেমন বলছে, লেখকের তরফের কোনো ছাঁকনি কাজ করছে না। তার ফলে একের পর এক বীভৎস ব্যাখ্যানের পুনরাবৃত্তি পাঠককে শিহরিত করতে করতে একসময় ক্লান্ত করছে। মূল চরিত্রদুটিকেও তাই ঠিকভাবে ফুটে উঠতে দেয় নি। আসলে কোনো বিশেষ চরিত্রকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলা বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। অনেকগুলি প্রায় এক রকমের চরিত্রসমাবেশে তাই সুইসাইড স্কোয়াডের আফরোজা কি পিতৃহন্তে নিহত বাদল অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

তবু 'এক নয় সাত এক' উপন্যাস থেকে শেষ পর্যন্ত যা বেরিয়ে এসেছে, তা হল, এক, পাকিস্তানীরা বৃষ্টি-কাদাকে দারুণ ভয় পায়, দুই, প্রধানত শহরের তরুণ ছেলেরাই মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিল, কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ বা মেয়েদের ভূমিকা নগণ্য, তিন, নির্যাতনের বিচিত্র বিভীষিকা, চার অবাঙালিদের প্রতি বাঙালি মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস, পাঁচ, যুদ্ধজয়ের পর সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের নেতৃত্বে অরাজকতা ও তাদের ক্রমশ সমাজ-বিরোধী হয়ে যাওয়া নিয়ে খেদ। আর, ভারতীয় সেনাবাহিনী উদ্ধার করতে আসার খবরে সকলের নিশ্চিন্ত ভাব — এবার আর কোনো ভয় নেই। মিনারা একজায়গায় বলছে, ''১৯৬৫ সাল। সেদিন আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পরম শত্রু।..... তখনও তো ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল শত্রুপক্ষ ভারতের আক্রমণের ভয়ে। আর আজ তারা আমাদের মিত্র ভ্রাতা হয়ে এসেছে।''

হয়তো দুই বাংলা একত্র হবার সুযোগ তখন এসেছিল, আজ মনে হচ্ছে। যেমন দুই জার্মানি এক হয়ে গেল।

রাজনৈতিক স্বার্থ তা হতে দেয় নি। তবে এ বিষয় নিয়ে বিলাপ করা অর্থহীন।

বোধ হয় দ্রুত লেখার কারণে উপন্যাসে কিছু কিছু ভাষাগত ত্রুটি রয়ে গেছে।

নির্বাচিত গল্প সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড· ঢাকা মূল্য : একশত বিশ টাকা এক নয় সাত এক · সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড মূল্য : পঁচাত্তর টাকা

গণতন্ত্রীকরণের পথে সার্কভুক্ত দেশগুলির স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

কামাল সিদ্দিকি সম্পাদিত গ্রন্থটিতে ''সার্ক'' - অন্তর্ভুক্ত সাতটি দেশের (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ,শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ) স্থানীয় শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দেশের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক মিল যেমন আছে তেমনই আছে তাদের মধ্যে রাজনীতিক-আর্থনীতিক পার্থক্য। সামাজিক-প্রশাসনিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই অঞ্চলের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা পরিশ্রমসাধ্য এবং চিত্তাকর্ষক হতে বাধ্য। এই ধরনের আলোচনা-গ্রন্থ এই বিষয়ে প্রথম। নিঃসন্দেহে বলা যায়, কামাল সিদ্দিকি ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ লোকাল গভর্নমেন্টের (NILG)সহকর্মীগণ এই কাজে সাফল্য লাভ করেছেন। কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও বর্তমান প্রকাশনাটি প্রশংসাযোগ্য কেননা প্রথম কাজে কিছু ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, যে সাতটি দেশের আলোচনা এখানে বিধৃত হয়েছে সেগুলির স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য ও গবেষণাভিত্তিক আলোচনা সমমানের নয়, সহজলভ্য নয় এবং সকল দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং সাদৃশ্যের তুলনার সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের তুলনাও গুরত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর মোট দারিদ্রতম মানুষের ৩৫ শতাংশ মানুষ দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দেশে বাস করে। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ যেখানে পৃথিবীর উন্নত ও বিকশিত অঞ্চলে এই হার ০.৮ শতাংশ । দারিদ্র এই অঞ্চলের সাধারণ আর্থনিতিক চরিত্র। সাতটি দেশের সবকটিতে পশ্চিমী উপনিবেশিকতার প্রভাব সমানভাবে পড়ে নি; নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ কখনই সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের ও উপনিবেশিকতার অধীনস্থ হয় নি। সাতটি দেশের রাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন — ভারত, ভুটান ও মালদ্বীপ ছাড়া অন্য দেশগুলিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন হয়েছে কয়েক বছর পর পর। সুতরাং স্থানিক সমস্যার মোকাবিলায় কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে কোন ধরনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে সে সম্বন্ধে এখনো বিবর্তন চলছে। পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানের ''বেসিক ডেমোক্রাসী'' ব্যবস্থা বা বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদের উপজিলা ব্যবস্থা ব্যাপারে আগ্রহ পরবর্তী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি; নেপালে রাজার রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়েছে। সুতরাং দ্রুত পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রিক দর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে অনেক দেশে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে বিকাশ প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অংশ হিসাবে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই ব্যাপারে সব দেশের মধ্যেই মিল আছে। এক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য দেশ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পরিবেশ ও সমস্যা অপেক্ষা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা তুলনা করলে বেশি উপকৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ''সার্ক'' (SAARC) যে প্রক্রিয়া শুরু করছে তাকে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের জন্য সম্প্রসারিত করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

প্রতিটি দেশের স্থানীয় শাসনের আলোচনা করা হয়েছে কয়েকটি বিষয় ধরে যেমন, উপক্রমণিকা, বিবর্তন, কাঠামো ও গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, অর্থ, কর্মচারী-প্রশাসন, এবং কেন্দ্রীয়-স্থানীয় শাসনের সম্পর্ক। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার আলোচনায় এই বিষয়গুলিই গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোন দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানলেই সেখানকার স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। সাতটি দেশের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ (generalisation) করলে দেখা যাবে, প্রতি দেশেই কর্তৃত্বমূলক স্থানীয় শাসনের শাসনব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, কিন্তু স্থানীয় শাসনের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নি। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রিক কাঠামোর ওপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ করার ব্যাপারে আসল কাজ খুব কমই হয়েছে। তৃতীয়ত, স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের ''নিজস্ব'' সম্পদের ব্যবস্থা খুব বেশি করা হয় নি; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদানের ওপরই স্থানীয় শাসনকে নির্ভর করতে হয়। চতুর্থত, স্থানীয় শাসনের প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব দেখা যায়। কামাল সিদ্দিকি ও তাঁর সহকর্মীরা এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের চাহিদা প্রশ্নাতীত। এমনকি তুলনামূলক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। কামাল সিদ্দিকি এই কাজটি সম্পন্ন করে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। শুধু একটি কথা বলার আছে যে, গ্রন্থটির রেফারেন্স তালিকা আরো বিশদ ও সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যে সব গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির থেকে উন্নতমানের গ্রন্থ ১৯৮০-র দশকে প্রকাশিত হলেও সেগুলি অনুল্লেখিত থেকে গেছে।

Kamal Siddiqui (ED) Local Government In South Asia : a Comparative Study University Press Dhaka 1992 Page xii + 345 Price: TK 500/-

চীনা কবিতার উজ্জ্বল রূপান্তর

দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়

চীনা সাহিত্যের কথা উঠলেই প্রথমে যে নাম মনে আসে তাঁর নাম লু শুন (১৮৮১-১৯৩৬)। ১৯১১ সালের

গণতান্ত্রিক বিপ্লব আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে আন্দোলনে ছিং বংশের দু-হাজার বছরের অপশাসনের অবসান হলেও দেশের আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রটি রয়েই গেল। তাই সংগ্রাম চললই, লু শুন ক্রমে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ হয়ে উঠলেন। তাঁর গল্প প্রবন্ধগুলি একদিকে যেমন আন্দোলনকে সংহত করে তুলল অন্যদিকে তেমনি গড়ে দিল আধুনিক চীনা সাহিত্যের সুঠাম পশ্চাৎপট।

কিন্তু এই শক্তিমান লেখক তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। তিনি গল্প-প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন ১৯১৮ সালে। ততদিনে তিনি লিখে ফেলেছেন দশ-দশটি কবিতা। তবে তাঁর কবিতার সংখ্যা কমবেশি শতখানেক — তাঁর বিপুল রচনাসম্ভারের ভগ্নাংশ মাত্র। তাঁর গদ্য কবিতা সংকলন 'বুনো ঘাস' ছাড়া ইতস্তত ছড়ানো আছে সত্তরটি কবিতা। অবশ্য তিনি নিজেই বলেছিলেন একদা — 'কবিতা লিখতে ভালো লাগে না তেমন, লিখি কিছুটা অভ্যাসবশে'। তাই বেশির ভাগই লেখা বান্ধবের অনুরোধে বা ক্যালিগ্রাফি করার জন্য। অনেকগুলিই কোন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় নি।

বিপ্লবাত্মক কবিতার প্রতি লু শুনের দুর্বলতা ছিল। ১৯৩৬ সালে নিহত তরুণ কমিউনিস্ট কবি ইন ফু-র কবিতার সপ্রশংস আলোচনায় তা ধরা পড়ে। তাঁর নিজেরও বেশি কিছু কবিতা এই রকম উদ্দীপক। প্রকৃত বিপ্লবাত্মক কবিতায় শোনা যায় কালের জোরালো কণ্ঠস্বর। শোষিত সমাজে নিত্য-জায়মান সংগ্রামী চেতনার সে ধাত্রী। সম্ভবত সময়ের টালমাটাল প্রেক্ষিতে কিছু চীনা কবির অগভীর পলায়নী মানস লু শুনকে বিচলিত করে থাকবে। তিনি বলেছেন, প্রাসাদের কোন অনাম্নী অঙ্গনার কবরের উপর বিনাশীর্ষক কবিতা বা নিষ্পত্র শুষ্ক গাছ দেখে মনের উদাসী বিক্ষেপ এক ধরনের ফাঁকা বিলাপ বা আত্মকরুণা মাত্র — সময়ের সমাজের সঙ্গত মূল্যায়ন নয়। তাই ব্যথিত লু শুন এই শতকের শুরুতেই কবিতা লিখতে বসেন। গল্প-প্রবন্ধে তিনি প্রতিবাদী হলেও বহুলাংশে তির্যক। কিন্তু কবিতাতেই তাঁর কলম শানানো সঙীনের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে — কবিতাতেই তাঁর ভালোলাগা মন্দ-লাগা, তাঁর বলিষ্ঠ মনন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়েছে। তাঁর কবিতা তাঁরই সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর কবিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

লু শুন অনুবাদ একটি সুকঠিন কর্ম। বিশেষত তাঁর কবিতা। একথা দীক্ষিত জন মাত্রেই জানেন। কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন প্রাচীন রূপক, দেশজ উপমা। বহুবার উঠে এসেছে নানা উদ্ভিদ, অর্কিড, ঘাস, আগাছা। তাঁর বাচনভঙ্গী দ্ব্যর্থক — তাতে কখনো বিদ্রূপের ঝাঁঝ, কখনো নমনীয় আত্মসমীক্ষা। সবার ওপরে আছে একটি অমল ছন্দের বিন্যাস। সেখানে এক একটি শব্দ একলাই গড়ে দিয়েছে কল্পনার জটিল বুনট। এইসব দুস্তর বাধা অতিক্রম করা যে কোনো অনুবাদকের পক্ষেই দুরূহ ব্যাপার। এমনিতেই চীনা অনুবাদের ক্ষেত্রে কতগুলি পরোক্ষ সমস্যা আছে। চীন প্রতিবেশী দেশ হলেও সেখানকার সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা ততটা ঘনিষ্ঠ নই — যতটা ফ্রান্স বা গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে। তবুও কিন্তু জঁ পল সার্ত্র-এর Les mots বাঙলায় অনূদিত হবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিশটি বছর। বদলের-কে পরিচয় করালেন বুদ্ধদেব বসু, এই তো সেদিন। এ বিলম্ব হয়তো অনুবাদকর্ম মেধাবী চর্চা বলে এদেশে কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি পায় নি বলেই। সুতরাং লু শুনের কবিতার অনুবাদগ্রন্থের জন্য পঞ্চাশ বছরেররও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে এ আর আশ্চর্য কি। লু শুনের কবিতার অনুবাদ বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু মূল থেকে সঠিক বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে এই প্রথম। শ্রীপ্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়কে এই অসামান্য প্রয়াসের জন্য অভিনন্দন।

প্রিয়দর্শী মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম আটত্রিশটি প্রাচীন ধাঁচে এবং শেষ সাতটি আধুনিক ও লোকগাথার ধাঁচে রচিত। গ্রন্থের শেষে কালানুক্রমিক সূচী দেখে দ্রুত বলে দেওয়া যায় অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগেরটির রচনাকাল ১৯০০ সালের মার্চ এবং সবশেষটির তারিখ ১৯৩৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর। এ সবের মধ্যে পঁয়ত্রিশখানা কবিতাই লু শুনের শেষ বেলাকার।

এই সংকলনে লু শুনের বেশি ভাগ কবিতাই 'ল্যুয়্' এবং 'চুয়েচু' পদ্ধতিতে লেখা। 'ল্যুয়্' হল আট পঙ্‌ক্তির কবিতা, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সাতটি করে শব্দ। এই ধরনের কবিতায় কল্পনা, ধ্বনি ও ব্যাকরণের পারস্পরিক সামঞ্জস্য এবং কলাতত্ত্বের প্রার্থিত সংযম হাজার বছর ধরে চীনা সাহিত্যে পরীক্ষিত হয়ে আসছে। কখনো বা তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন 'চুয়েচু' প্রকরণে — চার পঙ্‌ক্তির কবিতা, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পাঁচটি বা সাতটি শব্দ। 'ল্যুয়্'-র তুলনায় 'চুয়েচু' অনেক ঢিলেঢালা। এই দুই প্রকরণই থাং আমলে জনপ্রিয় ছিল। লু শুন নিজেও থাং-এর কাব্যপরিবেশে আবাল্য লালিত। স্বভাবতই 'ল্যুয়্' এবং 'চুয়েচু'র প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত। প্রখ্যাত থাং-কবি লি শাংইন-এর সঙ্গে লু শুনকে তুলনা করা হয়ে থাকে। অবশ্য লি-এর মতো জটিল রূপক ব্যবহার করেন নি লু শুন। কিন্তু প্রচলিত ধ্রুপদী আঙ্গিকেও লু শুন বিষয়বস্তুর অনন্যতায় অনা-কবিদের চেয়ে স্বতন্ত্র রয়ে গেলেন।

অনুবাদে প্রিয়দর্শী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চৈনিক 'ল্যুয়্' বা 'চুয়েচু'-র একটি সমান্তরাল বাঙলা প্রতিরূপ গড়া প্রায় অসম্ভব। কারণ ব্যবহৃত চীনা শব্দের অনেকগুলিরই অর্থের আয়তন ব্যাপক — কোনটিকেই একটি বাঙলা বা ইংরাজি শব্দে বাঁধা কঠিন। প্রিয়দর্শী সে চেষ্টা করেন নি। তিনি বাঙলা ছন্দের একটি পরিশীলিত গড়নকে বেছে নিয়েছেন। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত অনুরূপ ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থের লেখক ডব্লু. জে. এফ. জেনার-ও 'ল্যুয়্' বা 'চুয়েচু' অনুসরণ করেন নি। কিন্তু কবিতার মূলভাব অবিকৃত রাখার ক্ষেত্রে প্রিয়দর্শী জেনারের চেয়ে সতর্ক। যেমন 'নিজের ছবির পরে' কবিতায় তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে প্রিয়দর্শী রূপকটি রেখে দিয়েছেন — 'সুগন্ধী তৃণ চিনতে না পারে'। জেনার রাখেন নি, তিনি সরাসরি পৌঁছেছেন রূপকের অন্তর্লীন অর্থে — unrecognized। টীকায় প্রিয়দর্শী জানিয়েছেন সুগন্ধী তৃণ হল সাধারণ মানুষ, অবশ্য জেনার এ বাবদে নীরব।

লু শুনের কবিতার নিহিত বৈভব প্রিয়দর্শী যথাসম্ভব উদ্ধার করেছেন বাঙলা অনুবাদে। মূল কবিতার একটি বাঙলা ও ইংরেজি অনুবাদ বিবেচনা করা যাক। সপ্তম পৃষ্ঠায় আছে 'বিনাশীর্ষক' কবিতাটি — 'প্রাণ নিতে আছে সেনাপতি, /আর প্রাণ উদ্ধারে বদ্যি। / অধিকাংশের প্রাণ যায়, / তবু উদ্ধার পায় কিছু। / কতটুকু ক্ষতি পূরণ হয়েছে তাতে, / হায়রে হায়রে হায়! জেনারের Lu xun Selected Poems গ্রন্থের সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় এই কবিতাটির নাম রাখা হয়েছে Untitled — ' When the generals kill,/ Doctors have to save. / After most are killed, / A few escape the grave. / It hardly makes the losses less, / Alas'.

ইংরেজি অনুবাদের When এবং After মূলে নেই। এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার না করেই বঙ্গানুবাদ কিন্তু মূলানুগ হতে পেরেছে — এখানেই বাঙলা ভাষার নমনীয়তা। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে লু শুন ভেঙে পড়ছেন। হাহাকারের ব্যাপকতা বোঝাতে কবি শেষ পঙ্‌ক্তির চারটি শব্দকেই

হায়-বোধক করেছেন। তাই বঙ্গানুবাদের শেষ পঙ্‌ক্তিতে প্রার্থিত ব্যঞ্জনাটি আমরা পেয়ে যাই।

প্রতিটি কবিতার টীকা আলোচ্য গ্রন্থের মূল্যবান সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে এই টীকা ভিন্ন কবিতাগুলি বোঝা দুরূহ। টীকাতেই আছে কবিতা রচনার পটভূমি, লু শুনের পরিবর্তনশীল অনুভবের ইতিবৃত্ত, রূপক-উপমার অর্থ ও প্রেক্ষাপট। যেমন, 'কাঁটা ঝোপঝাড়, বুনো ঘাস' বলতে বোঝায় একসময়ে মহান-লক্ষ্যে-উৎসর্গীকৃত একদল মানুষের নৈতিক ও মানসিক অবনতি। 'হাওয়ার উন্মত্ততা' হল জাপানী আগ্রাসনের ঝঞ্ঝা। কিম্বা 'রূপসী' শব্দের অর্থ নতুন পথপ্রদর্শক। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তবে আটত্রিশটি প্রাচীন ধাঁচে রচিত কবিতা এবং সাতটি আধুনিক ধাঁচে ও লোকগাথার ধাঁচে রচিত কবিতার অনুবাদে রীতির তফাৎ তেমন চোখে পড়ে না, ভাষাগত পার্থক্যও খুব একটা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দও আধুনিক বাংলা কবিতায় ততটা প্রচলিত নয়। যেমন, মর্মরানি, চারিভিতে, দৌঁহে, আলা, মাঝারে, নিরিবিলে, ভাতে, লাগি ইত্যাদি। কোন কোন সময়ে ছন্দের ব্যবহার কিছুটা ঢিলেঢালা। যেমন, 'উচিয়ামাকে দিলাম' কবিতায় অনুবাদক ৬-৬-৬-২ মাত্রায় শুরু করলেও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে বিন্যাস বদলে হয়ে যায় ৬-৬-৬-৩ মাত্রার। কখনো কখনো মাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষায় 'ও', 'ই' র ব্যবহার কৌশলগতভাবে সঠিক হলেও অন্য বিকল্প বাঙলা শব্দে তার রূপান্তর অনেক লাগসই হত। যেমন 'নিজের ছবির পরে' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি — 'আত্মার বেদী কোনও ক্রমেই ঠেকাতে না পারে দেবগণ',

বইটির ছাপা উন্নত মানের নয়, বাঁধাই খারাপ। প্রচ্ছদ তেমন করে টানে না। এ সব সত্ত্বেও অনুবাদকের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম এবং চীনা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান গ্রন্থটিকে পাঠকের কাছে গ্রাহ্য করে তুলেছে। চীনা সাহিত্যের ব্যাপকতর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি তাঁকে এবং অন্য উৎসুক জনকে প্রেরণা যোগাবে।

লু শুনের কবিতা প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায় প্রকাশক: বাউলমন প্রকাশন ২৮ বালিগঞ্জ গার্ডেনস কলকাতা - ৭০০ ০১৯ মূল্য ১৮ টাকা

সুভো ঠাকুর

শ্রীপান্থ

প্রথম কবে দেখেছিলাম সুভো ঠাকুরকে? সাল তারিখ মনে নেই, ঘটনাটি মনে আছে। তখন 'সুন্দরম্' বের হচ্ছে। কাগজটি নিয়মিত দেখতাম। ভালো লাগত। মনে ইচ্ছা, সুন্দরম্-এ প্রবন্ধ লিখব। তখন বয়স কম, আলস্যও কম। একটু খেটেখুটে লিখেই ফেললাম। সুন্দরম্-এ ছাপা হতে পারে এমন একটি লেখা — বাংলা শিশু গ্রন্থসজ্জার একশ বছর। একশ কোন্ হিসাবে, এখন আর তা মনে নেই। লেখাটি নিয়ে একদিন হানা দিলাম সুন্দরম্ অফিসে। লেখার সঙ্গে খান-কয় ছবিও ছিল। এক বন্ধু তাঁর সস্তার ক্যামেরায় ছবিগুলো কপি করে দিয়েছিলেন। কম বয়সে যা হয়, মন বলছে এমন একটি সচিত্র-রচনা হাতে পেলে সুভো ঠাকুর লুফে নেবেন। কিন্তু তার আগেই স্বপ্নভঙ্গ। সুন্দরমের অফিস তখন ধর্মতলায় পুরানো একটি বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, সামনে বিখ্যাত সেই গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা মূর্তিমান সুভো ঠাকুর। হাতে কিছু কাগজ পত্র। মনে হল কাগজে মোড়া দু-একখানা ব্লকও রয়েছে। বললেন, কাকে চাই? উত্তর দিলাম — আপনাকে। — কেন ভাই? বললাম — সুন্দরম্-এর পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখা এনেছি, আপনাকে দেখাতে চাই। সুভো ঠাকুর বললেন, আমাদের তো ভাই কোনও পুজো সংখ্যা নেই, তবে পুজোর সময় যে সংখ্যাটি বের হবে তার কাজ প্রায় শেষ। শুনে মনটা দমে গেল। একবার ভাবলাম পরের সংখ্যার জন্য রেখে যাই। কিন্তু সেটা অধৈর্যের বয়স। সুতরাং নমস্কার করে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। অফিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলাম না। সিঁড়িতেই সম্পাদকের সঙ্গে কথোপকথন শেষ। পর দিনই ওই রচনাটি নিয়ে হানা দিয়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকার অফিসে। সাগরময় ঘোষ লেখা এবং ছবি দেখে বললেন — আগে পেলে হয়তো, পুজো সংখ্যায় দেওয়া যেত। এখন তো আর সময় নেই। তবে, রেখে যেতে পারেন। সেখানে কিন্তু নির্দ্বিধায় রেখেই এসেছিলাম এবং 'দেশ' পত্রিকায় সাধারণ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল লেখাটি।

তারপর, বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে সুন্দরম্-এর আশ্চর্য সম্পাদকীয়গুলো ছাড়াও সুভো ঠাকুর যে পদ্য গদ্য আরও লিখেছেন, ততদিনে তা আমার জানা হয়ে গেছে। বস্তুত, প্রথম হাতে পড়েছিল 'প্যানসি ও পিকো'। তার কটি ছত্র সুভো ঠাকুর সম্পর্কে আরও কৌতূহলী করে তুলেছিল আমাকে। বাক্যগুলো এখনও আমার মনে আছে। '— পোয়েট টেগর হন কে তোমার জোড়াসাঁকোতেই থাক? /বাবার খুড় হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাক ...., /ক্ষমা কোরো আর, জোড়াসাঁকোতেই রয়েছে যদিও অংশ/পায়রার খোপ্ বহুদিন ত্যাজি উড়েছি হইয়া হংস!' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুভোগেন্দ্র, ওরফে সুভো ঠাকুর ২৬ বছর বয়সে বিদ্রোহের পতাকা হাতে নিয়ে ঠাকুর বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়ে এসেছিলেন, তারপর আর পিছু ফেরেন নি, এই সংবাদ শোনার পর, তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ আমার দিনে দিনে বেড়েই চলে। ওঁকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁদের কারও কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সুভো ঠাকুরের লেখা বই যার কাছে যা পেয়েছি, আগ্রহ করে পড়েছি। 'নীল রক্ত লাল হয়ে গেল', 'অলাত চক্র' এবং আত্মজীবনীমূলক আরও একটি বই — যার নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না — পড়ে তাঁর ভাষার নিজস্বতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা এবং নিজের জীবন সম্পর্কে অকপট কথাবার্তা আমাকে বলতে গেলে একজন ভক্তে পরিণত করে। ওঁর এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, কম বয়সে সুভো ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের লেখালেখিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য ঠাকুর বাড়িতে সকাল বেলায় গ্যারেজ থেকে নিজের বাড়িতে বার বার স্টার্ট নিয়ে কোলাহল সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। তৎকালে সে সুভো ঠাকুর অনেকের কাছেই এক চপলমতি, অসামাজিক তরুণ যেন। কেননা, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় নিজের নাটক মঞ্চস্থ করছেন দেখে তিনি গ্র্যান্ড হোটেলের বল রুম ভাড়া করে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজের নাটক মঞ্চস্থ করালেন — 'রুদ্ররাজ'। 'মায়ামৃগ' নামে একটি নিজের লেখা অপেরাও নাকি অভিনয় করিয়েছিলেন তিনি। তা ছাড়া একের পর এক অপ্রকাশিত কাগজ — 'চতুরঙ্গ', 'ভবিষ্যৎ', 'অগ্রগতি', — সুভো ঠাকুর এসব অন্য ধরনের কাগজের হয় সম্পাদক, নয় প্রাণপুরুষ।

চতুরঙ্গ কাগজটি বের হত জোড়াসাঁকো থেকে। সম্পাদক ছিলেন পিতা ঋতেন্দ্রনাথ এবং পুত্র সুভোগেন্দ্রনাথ। কৈশোরের এই দীক্ষা যে সুভো ঠাকুর বিস্মৃত হন নি সম্পাদক হিসাবে পরবর্তী কালে তাঁর তৎপরতাই প্রমাণ। 'সুন্দরম্' সম্পাদক সুভো ঠাকুরের শেষ কীর্তি। সম্ভবত, শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আজ চিত্রশিল্পের অনেক প্রসার ঘটেছে। মুদ্রণ ব্যবস্থায় অনেক যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছে। এই শহরে লেখক এবং শিল্পীর অভাব নেই। অভাব নেই প্রকাশকেরও। কিন্তু সুন্দরমের মতো আর একটি কাগজ আমরা করতে পারলাম কই? আরও একটি কথা মনে হয় হুমায়ুন কবীর, আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত যে 'চতুরঙ্গ' আমরা দেখি তার সঙ্গে সুভো ঠাকুরের সম্পর্কের কথা আমরা জানি। এমনও তো হতে পারে এই 'চতুরঙ্গ' ঋতেন্দ্রনাথ-সুভোগেন্দ্রনাথের চতুরঙ্গেরই উত্তরসূরি। হয়তো, সুভো ঠাকুরই বন্ধুদের বলেছিলেন নামটি গ্রহণ করতে। এটা অবশ্য আমার অনুমান মাত্র।

সম্পাদক সুভো ঠাকুরকে নিয়ে যেমন পর্যালোচনা হওয়া উচিত তেমনই আলোচনা চলতে পারে কবি এবং লেখক সুভো ঠাকুরকে নিয়েও। সাহিত্যের মূলধারার বাইরে যাঁরা প্রথাগত রীতি-পদ্ধতির বদলে নিজস্ব পথ করে নিতে চান, তাঁরা অবশ্যই গবেষক-সমালোচদের মনোযোগ দাবি করতে পারেন। আমাদের সৌভাগ্য কমলকুমার মজুমদার তা পেরেছেন। আজ তিনি বহু আলোচিত। দুর্ভাগ্য সুভো ঠাকুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দুজনের প্রতিভা সমগোত্রের এমন কথা বলছি না। কিন্তু সুভো ঠাকুরের বাক্‌ধারা, রচনাশৈলী এবং বক্তব্য যে ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ একক বিচ্ছিন্ন একটি উদ্যোগ সে কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই। 'প্যানসি ও পিকো' ছাড়াও তাঁর কবিতার বইয়ের তালিকায় আছে — 'কাঁকর', 'স্বপ্নশেষ' এবং 'অতন্দ্র আলতামিরা'। শেষ বইটি মৃত্যুর অল্প ক-বছর আগে লেখা। বলা যায়, এক ধরনের আত্মকথা। তাঁর কাল, তাঁর অ্যাডভেঞ্চার, তাঁর নেশা, তাঁর শখ — সবেরই সন্ধান আছে এই বইয়ের কবিতাগুলোতে। 'আঠারোই পোষ' নামক কবিতায় নিজেকে তিনি বলেছেন, 'একদা, এই যুগের শেষ কাপ্তেন' বলে। জীবন সম্পর্কে এই কাপ্তেনের বক্তব্য —"কিছুই নেই তো, /হাতের মুঠোয়-ধরা/দিনগুলোই তখন, /দুহাতে ওড়াতে/লাগলো সে —"। কিন্তু, শুধুই কি তাই করে গেছেন সুভো ঠাকুর? অবশ্যই নয়।

নাটক লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, রম্য-রচনা লিখেছেন, এমনকি ছোটদের জন্য একাধিক গল্প, কবিতা বইও। নিজের লেখাকে নিজে তিনি অকিঞ্চিৎকর মনে করলেও আগেই বলেছি তাতে রয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তার স্পষ্ট স্বাক্ষর। সুভোঠাকুর শুধুই লেখক নন, তিনি একজন চিত্রকরও। লেখার মতো চিত্রকলায়ও সুস্পষ্ট তাঁর নিজস্বতা। অনেকেই জানেন না বিখ্যাত ক্যালকাটা গ্রুপ গড়ে উঠেছিল প্রথমে তাঁরই আস্তানায়। দু-বছর সরকারি আর্ট কলেজে তালিম নিয়েছিলেন তিনি। গুরু মেনেছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদকে। মানসগুরু ছিলেন যামিনী রায়। সুভো ঠাকুরের ছবি নিয়ে সমকালে অনেক বিশিষ্ট শিল্পানুরাগী এবং বোদ্ধা আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রেও, আমার মতে নতুন করে আলোচনার অবকাশ আছে। পুব আর পশ্চিম মিলিয়ে যে স্টাইল তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা একদিকে যেমন ভারতীয় অন্য দিকে পশ্চিমের প্রভাবও গোপন নেই তাতে। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বা যামিনী রায়ের সঙ্গে নৈকট্য দিয়ে ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর আবেগ, উত্তেজনা, বিদ্রোহ সবই ধরা পড়েছে বিশাল বিশাল ওই সব পটে। নিজের প্রথম একক প্রদর্শনী করেছিলেন ২৭ বছর বয়সে, শেষ বৃহৎ প্রদর্শনী স্বাধীনতার পরে রাজভবনে। এবার বোধ হয় সময় হয়েছে আর একটি প্রদর্শনীর। চিত্রকর সুভো ঠাকুরের মূল্যায়নের জন্য সেটা কিন্তু জরুরি।

সুভো ঠাকুর শিল্প-সংগ্রাহকও বটে। অনেকেই জানেন না ভারতীয় কারুশিল্প সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কতখানি গভীর ছিল। ভারত সরকারের তরফে বিদেশে একাধিক কারুশিল্পের আয়োজন করেছিলেন তিনি। ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে স্বদেশের শিল্পসম্ভার নিয়ে পুবে এবং পশ্চিমে একাধিক বার অভিযাত্রী হয়েছিলেন তিনি। সেই নিবিড় পরিচয়ের সূত্রেই ক্রমে কারুশিল্প সংগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় তাঁর নেশা। আর সেই নেশা উপলক্ষেই সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয়। সাল তারিখ এবারও মনে নেই। মনে আছে কালটা ছিল বর্ষা। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশেষ ফিচার লেখক হিসাবে যোগ দিয়েছি। নানা বিষয়ে নিজের মতো করে, মামুলি সংবাদ বহির্ভূত কিছু লেখাই তখন আমার কাজ। অফিস থেকে একদিন নির্দেশ এল আমাকে জনাই যেতে হবে। কেননা, সেখানে সুভো ঠাকুর একটি শিল্প সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। কৃত্রিম পাহাড় হবে, গুহা হবে। সে গুহায় সুভো ঠাকুর নিজেই ছবি আঁকবেন। কাছাকাছি অট্টালিকায় থাকবে তাঁর শিল্প সংগ্রহ। শুনে লোভই হল। অফিস থেকে বলা হল যাতায়াতের ব্যবস্থা সুভো ঠাকুর নিজেই করছেন। আপনার জন্য তিনি সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এ অপেক্ষা করবেন। যথা সময়ে আমি সেখানে হাজির হলাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর বার্তা সম্পাদক ধীরেন দাশগুপ্ত মশাই। আমরা গুছিয়ে বসতে না বসতে শুরু হল বৃষ্টি।

সুভো ঠাকুর বলছেন, বউ বাজারের কোনও দোকানে খাবার অর্ডার দেওয়া আছে। গাড়ি গেছে সেগুলো আনতে, এলেই রওনা দেব। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা তিনজনই যাব? সুভো ঠাকুর বললেন, না, অন্যরা সবাই জনাই পৌঁছে গেছেন। আমি খাবার আর ড্রিঙ্কস্ নিয়ে যাব। অন্যরা বলতে কারা তাও মোটামুটি শোনালেন তিনি। বলতে গেলে কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের মাথা মাথা সব ব্যক্তিরা। তাছাড়া রাইটার্স বিল্ডিং এবং লালবাজারের জনা কয়েক কর্তা। কেউ কেউ নাকি সস্ত্রীক। সব শুনে মনে হল বিরাট এক পার্টির আয়োজন করেছেন তিনি জনাইয়ে। এদিকে কিন্তু বৃষ্টির বেগ বেড়েই চলেছে। থামবার কোনও লক্ষণ নেই। আমি উদ্বিগ্ন। ধীরেন দাশগুপ্ত মশাইও ছটফট করছেন। কিন্তু সুভোবাবু নিরুদ্বেগ। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে

চলেছে সাতটা থেকে আটটা, আটটা থেকে নটা। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখা গেল কলকাতা ভাসছে। জনাই পৌঁছানো অসম্ভব। তখন প্রশ্ন শুধু একটাই। যাঁরা সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তাঁদের কী হবে? সুভো ঠাকুর বললেন, 'তাই তো'। তিনি আমাদের দু-জনকে আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা বললাম, তার কোনও দরকার নেই। ধীরেনবাবু অফিস যাবেন, অফিস কাছেই। আমিও কাছাকাছি থাকি, ঠিক চলে যাব। আপনি বরং ওঁদের কথাই ভাবুন। শুরু হল সুভো ঠাকুরের ভাবনা। ফোনের পর ফোন। কখনও হ্যালো লালবাজার? কখনও হ্যালো হাওড়া স্টেশন? কখনও বা হ্যালো জনাই রোড? বলা বাহুল্য, ওদিক থেকে কারও কোনও শব্দ নেই। আমরা যখন বেড়িয়ে আসছি সুভো ঠাকুর তখনও কানে ফোন লাগিয়ে 'হ্যালো', 'হ্যালো' করছেন।

বৃষ্টি সেদিন সব ধুয়ে মুছে দিয়ে ছিল। কিন্তু আমার ভাগ্যে প্রাপ্তিও ছিল কিছু। সে সুভো ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এবং সেই পরিচয় সূত্রেই স্বল্প কালের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। দিনের পর দিন দেখার সুযোগ হয়েছে ওঁকে। এই সংসারীদের পৃথিবীতে তিনি ছিলেন সত্যিই আশ্চর্য এক 'বোহেমিয়ান'। তাঁর চলনে বলনে শেষ দিন পর্যন্ত ছিল ঠাকুর বাড়ির প্রবাদতুল্য শিষ্টতা, 'নীল রক্ত, লাল হয়ে গেছে' সুভো ঠাকুরের এই উক্তি নিছক কথার কথা ছিল না। তিনি অনায়াসে মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে পারতেন। প্রাঙ্গণের বেড়া ডিঙিয়ে, সোজাসুজি চলে আসতে পারতেন এ পাড়ার প্রাঙ্গণে। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে তাঁর ব্যস্ততার কথা শুনেছি। নানা রচনায় দেখেছি সংগ্রামী দীনজনের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা। অথচ ভব্যতা, নম্রতা, মার্জিত রুচি এবং উদারতায় তিনি ঠাকুর বাড়ির সেই বনেদিয়ানারই উত্তরাধিকারী যেন। যেন শিল্পীসত্তার কথা মনে রাখলে শেষ উত্তরাধিকারী।

সংসারে সন্ন্যাসী বলে একটা কথা শোনা যায়। কিন্তু সুভো ঠাকুরের মতো সন্ন্যাসী বোধ হয় কদাচিৎ দেখা যায়। আমার মনে পড়ে তাঁর বড়ো ছেলে দিল্লীতে ভালো 'পাশ দিয়েছে' শুনে তাঁর চিন্তিত মুখে সুভোবাবু বললেন, মুশকিল এই, আরতি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, কী পাস? বললেন, তা তো জানি নে ভাই! যে সব জানেন আরতি। আরতি মানে ওঁর স্ত্রী। এমন গুণী, নিরহঙ্কারী, অমায়িক এবং উদারচেতা মহিলা খুব কমই দেখা যায়। দুটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে এই উদাসীন পিতার পক্ষে কোনও বোঝায় পরিণত না হতে দিয়ে স্বেচ্ছায় তিনি বহন করেছেন তাদের দায়। তাঁর সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নি। এই শিল্পী-দম্পতির ছেলে-মেয়েরা সবাই শিল্পগত প্রাণ। বড়ো ছেলে সিদ্ধার্থ শিল্পরসিক, শহরে শহরে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজক। ছোট ছেলে সুন্দরম প্রবাসী। তাঁর চর্চার বিষয় ভারতীয় শিল্পকলা। অক্সফোর্ডে তাই নিয়ে গবেষণা করছে সে। কন্যা চিত্রলেখা নিজেই একজন শিল্পী। পিতার বিরুদ্ধে উদাসীনতার কোনও অভিযোগ নেই, এঁদের কারও। আমার মনে পড়ে চিত্রলেখার বিয়ের দিনটির কথা। হঠাৎ অফিসে ফোন পেয়েছিলাম সুভোবাবুর— 'সন্ধ্যায় দয়া করে একবার আসবেন' — কী ব্যাপার? আজ আমার কন্যার বিবাহ। বিয়ের নেমতন্ন যে, ফোনে করা যায় অন্তত সুভো ঠাকুর যে করতে পারেন তা আমি অনায়াসে মেনেই নিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর যা বললেন, তা শুনে আমি স্তম্ভিত। বললেন, আরও দু-একজনকে ফোনে তাঁর হয়ে নেমতন্ন করতে। সে দু-একজনের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা ছিলেন, যাঁদের কাছে ফোন করতে হলেও সেক্রেটারি ডিঙিয়ে পৌঁছাতে হয়। আমি বললাম, এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? সুভোবাবুর সহজ উত্তর — কী করব ভাই, হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। মোটে সময় পেলাম না। গিয়ে দেখলাম গোটা কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাজির তাঁর আস্তানায়। আর সকলের মুখেই এক কথা — ফোন পেয়ে বাধ্য হয়েই আসতে হল!

এই ছিলেন সুভো ঠাকুর। চলে যাওয়ার মাত্র কদিন আগে একটা রাত কাটিয়ে ছিলেন আমাদের বাড়িতে। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দুজনে মাঝরাত্তির পর্যন্ত কত না মন্ত্রণা! একটা স্বপ্ন ছিল পায়ে হেঁটে আফগানিস্তান যাবেন। একটা স্বপ্ন ছিল নিজের সংগ্রহ নিয়ে বিশাল এক সংগ্রহশালা গড়ে তুলবেন। সাধ ছিল নিজের সব লেখা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দু-খণ্ডে রচনাবলি ছাপাবেন। অথচ 'অতন্দ্র আলতামিরা'য় দেখি মৃত্যু ভাবনা এক-আনন্দ-ভাবনায় পরিণত করে নিয়েছেন তিনি। — 'আজীবন যা-কিছু খুঁজেছি,/শুধুমাত্র এটুকু বুঝেছি—/জীবন তো শুধু ছেলে খেলা:/কুড়িয়ে আনার,/আর, দূরে ছুঁড়ে ফেলা!' এসব তাঁর কথা হতে পারে, কিন্তু, আমি জানি, সেই রাত্তিরে যে-সব স্বপ্ন নিয়ে আমাকে স্বপ্নাতুর করে তুলেছিলেন তিনি সেগুলো তাঁরই স্বপ্ন কথা।

'মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ', 'মেটিয়াবুরুজের নবাব', 'মঙ্গল পাণ্ডের বিচার', 'কেয়াবাৎ মেয়ে', ইত্যাদি গ্রন্থের রসাস্বাদন যাঁরা করেছেন তাঁদের সঙ্গে উল্লিখিত বইগুলির লেখক শ্রীপান্থের নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই।

উডকাট : একটি লুপ্ত শিল্পকর্ম

জয়ন্ত বাক্‌চি

মুদ্রণশিল্পে যে দ্রুতগতি বিকাশ ঘটেছে; তার যদি কোনো লেখচিত্র আঁকা যায়, দেখা যাবে বিকাশরেখাটি একেবারে খাড়াই ওপরে উঠেছে। সদাসর্বদাই প্রকাশ ঘটছে অকল্পনীয় সৃজনশীলতার। ইলেকট্রনিকস আর কমপিউটার তো এখন মুদ্রণশিল্পে এনে দিয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন — বিশেষ করে লিপি বিন্যাস এবং গ্রাফিকসে। এত করেও সৃজনশীলতার তৃষ্ণা যেন মিটছে না। এরা যেন এখন আকাশ ডিঙোতে চান। বহু আপাত-অসম্ভবকে সম্ভব করা যাচ্ছে এখন। এই প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই। এবং সেই সঙ্গে ফিরে যাই এর উৎস সন্ধানে — সেই ইতিহাস যা অনুপ্রাণিত করেছে বর্তমান মুদ্রণ শিল্পকে এবং আরও উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের।

অত্যাধুনিক কারিগরি কৌশল আজকের মুদ্রণশিল্পে যে অবিশ্বাস্য গতি আর বিপুল সামর্থ্য এনে দিয়েছে তার ফলে অতীতের সমস্ত প্রচেষ্টাগুলোকেই এখন আমরা সেকেলে আর ভোঁতা বলে উড়িয়ে দিতে চাই। কিন্তু মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না সেকালের নিপুণ সব কারিগর-শিল্পীদের কথা স্মরণ করি যাঁরা হাতে শুধু ছেনি-বাটালি নিয়ে ছাপার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বাস্তবে রূপ দিতেন।

কাঠ খোদাই ব্লক-কারিগরদের সেই সুবর্ণ যুগ এখন গত দিনের স্মৃতি। নেই সেই নিপুণ কারিগরবৃন্দ যাঁদের শিল্পী বললে অত্যুক্তি হয় না এতটুকু। যাঁরা সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে কাঠের ওপর খোদাই করে তুলতেন একের পর এক অসামান্য শিল্পকর্ম — যাঁদের না হলে ছাপাখানার কোনো অস্তিত্বই থাকত না, এই চমকপ্রদ উন্নতি তো অনেক পরের কথা। ইতিহাসের পথে স্মৃতিচারণে হাঁটতে হাঁটতে একবার এই শিল্পীদের দিকে ফিরে তাকানো যাক।

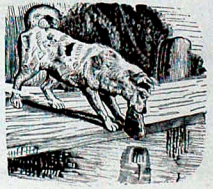

বেণীমাধব ভট্টাচার্য-কৃত কালীঘাটের কালী

এদেশীয় কাঠ খোদাই ব্লক-নির্মাতা রূপে যাঁর নাম প্রথম চোখে পড়ে তিনি রামচন্দ্র রায়। 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬) বইতে তাঁর তৈরি ছ-টি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছিল। এটিই বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সচিত্র বই। এটির প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং মুদ্রক ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে কলকাতার খিদিরপুরে এদেশীয় ছাপাখানার সূচনা করেন বঙ্গদেশীয় জনৈক বাবুরাম, (১৮০৭)। রামচন্দ্রে পদাঙ্ক অনুসরণকারী আর একজন প্রথিতযশা শিল্পী কাশীনাথ মিস্ত্রির উডকাট ব্লক জয়েস-এর বই 'ডায়লগাস অন মেকানিকস অ্যান্ড অ্যাসট্রোনমি'-তে স্থান পেয়েছে। এরপর শোনা যায় জোড়াসাঁকোর হরিহর ব্যানার্জীর নাম। যাঁর চমৎকার সব শিল্প-নিদর্শনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে 'ফ্রেনডস অব ইনডিয়া' পত্রিকায়।

প্রতিতুলনা : কিশোরীমোহন বাক্চির প্রতিকৃতি

বাঁ দিকে: উডকাট ব্লক: প্রিয়গোপাল দাশ
ডান দিকে: হাফটোন ব্লক

এই সময়টা ছিল বাঙলার ইতিহাসে উডকাট ব্লক-নির্মাতাদের স্বর্ণযুগ। শুধু দেশীয়রাই নন, ব্রিটেন এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ থেকে নামীদামী শিল্পীরা এদেশে আসতে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ দেশীয়-অভিজাতদের প্রতিকৃতি এঁকে নাম কেনেন। আবার অনেকেই মিশে যান কাঠখোদাই ব্লক নির্মাতাদের সঙ্গে। দেশী-বিদেশী এইসব কারিগরদের শিল্পকর্ম সে-সময়ের মুদ্রণশিল্পের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

১৮৫৪-তে প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা স্কুল অব ইনডাসট্রিয়াল আর্ট। এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সদস্যরা। বহু নামকরা উডকাট ব্লক-নির্মাতা এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করে গেছেন। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটিই পরিণত হয় গভরনমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কলকাতায় প্রায় ৪৬টি ছাপাখানা বসে গেছে। প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৩০০টি বই। বটতলা থেকে বেশ কয়েকটি ভালো বই প্রকাশিত হলেও বেশির ভাগ বইয়েরই বিষয়, ছাপা এবং বাঁধাই খুব একটা উঁচু মানের ছিল না। ব্যবহার হত সস্তার কাগজ। ফলে বটতলার বইয়ের তেমন স্বীকৃতি মেলে নি। যদিও বইকে ক্রেতার কাছে আর্কষণীয় করে তোলার জন্য থাকত প্রচুর সচিত্রকরণ। আর এখানেই উডকাট-শিল্পীরা দেখাতেন তাঁদের ভেলকি। নিছক চোখ, দক্ষতা আর অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে যেভাবে উডকাট-ব্লকে টোন (স্ক্রিন) এর ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন এঁরা, তা আজও আমাদের চোখে বিস্ময়।

পশ্চিম-ভারতের তুলনায় বাঙলায় মুদ্রণশিল্প শুরু হয়েছিল বেশ একটু দেরি করে, প্রায় দুশো বছর পর (১৭৭৮-৭৯)। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কলকাতায় বেশ কয়েকটি ছাপাখানা বসে গেছে বটতলা, গড়ানহাটায় — যে অঞ্চলটি ইংরেজদের কাছে ব্ল্যাক টাউন নামে পরিচিত — এখানেই এসে জড়ো হয়েছেন রাজোর যত মুদ্রক, প্রকাশক, উডকাট ব্লক-নির্মাতা আর পুস্তক ব্যবসায়ীরা।

ছাপাখানায় খোদাইকাজের কারিগরি নাম উডকাটস। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কাঠ ছাপার এত ধকল সইতে পারে না। একটানা ছাপা চলতে থাকলে কাঠের ব্লক দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট ব্লকের যখন অনেকগুলো মুদ্রণ প্রয়োজন, বিশেষত বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে কিংবা একটানা ছাপার কাজে বা ফরমার ওপর-নীচে (মাসট এবং টেইলপিস) কাঠের ব্লক দেখা গেল বেশিক্ষণ টেকে না। এই অসুবিধে দূর করতে এল ইলেকট্রোস-এর ব্যবহার। এই বিশেষ কারিগরি-কৌশলটির নির্মাণ কাঠের ব্লক থেকেই। ইয়োরোপ থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়ে অচিরেই এসে পৌঁছল ভারতে। এর পদ্ধতিটা হল — কাঠের ব্লক থেকে প্রথমে একটা মোমের ছাঁচ তৈরি করে নেওয়া হত। এরপর ইলেকট্রোলাইসিস পদ্ধতিতে এই ছাঁচের ওপর তামার একটা মিহি আস্তরণ জমা করা হত; তার ওপর ঢালা হত গলানো সীসা। পরে এটাকে ছাপার উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট কাঠের ওপর বসানো হত। তৈরি হয়ে গেল ব্লক। সংক্ষেপে এই হল ইলেকট্রোস পদ্ধতি। যেহেতু তামার সহনশীলতা অনেক বেশি তাই এই ব্লক টেঁকে অনেকদিন। আবার মূল কাঠের ব্লক থেকে প্রয়োজনীয় অনেক নকল করে নেওয়াও সম্ভব। আর মূল কাঠের ব্লকটি দীর্ঘদিন অবিকৃতভাবে রেখে দেওয়ারও সুবিধে থাকে। সে-সময়ে বিভিন্ন টাইপ-ফাউনড্রির নমুনা-তালিকায় (ক্যাটালগ) নানাধরনের ইলেকট্রোসের ব্যবহার বিধির উল্লেখ থাকত। তখনও অবশ্য কাঠের টাইপ উৎপাদন অব্যাহত ছিল।

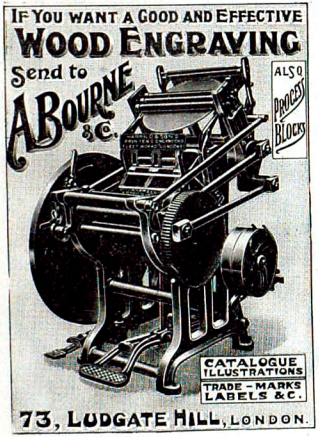

উপরে: রঙিন উডকাট
বাদিকা সহ নৃত্যরতা নারী : শ্রী নৃত্যলাল দত্ত
বাঁ দিকে: ব্রিটিশ প্রিনটার-এ ১৯০৮, উডকাট ব্লকনির্মাতার বিজ্ঞাপন : এটিও একটি উডকাট ব্লক

বিশ শতকের চার দশকের মধ্যেই নতুন উন্নত কারিগরি-কৌশল, ক্রমবর্ধমান শ্রমমূল্য — এ সবের ফলে সারা দুনিয়া জুড়ে শুরু হল জিঙ্ক (দস্তা) ব্লকের ব্যবহার। এর ফলে যে ছাপার মানই শুধু উন্নত হল তাই নয় খরচের সাশ্রয়ও হল অনেক। ছাপাখানার কাজে জিঙ্ক ব্লকের চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল উডকাটেরও হতদ্দশা। ওই গরানহাটাতেই উডকাট ব্লকের শেষ প্রতিনিধিরা আজও টিম টিম করে জ্বলছেন কোনো মতে। এক সময়ে যেখানে তাঁরা দাপটে রাজত্ব করেছেন। যন্ত্রসভ্যতা যেখানে তুচ্ছ করে দিয়েছে ব্যক্তিগত অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা। সর্বগ্রাসী মুনাফা-কেন্দ্রিক উৎপাদন হস্তশিল্প কারিগরদের জীর্ণ থেকে জীর্ণতর করে দিয়েছে।

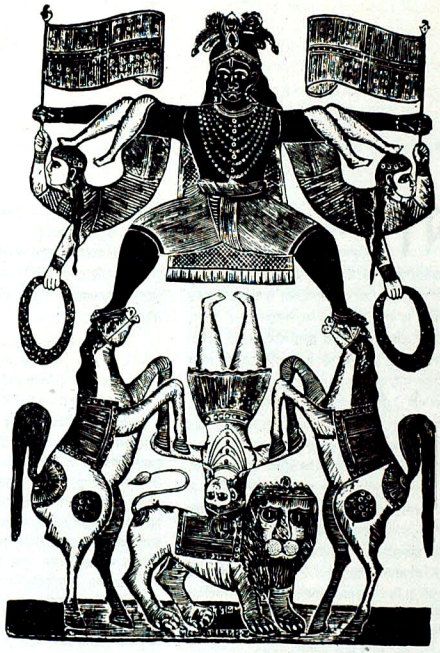

সার্কাস দৃশ্য :
শ্রী নৃত্যলাল দত্ত

কিছু উডকাট ব্লকের নমুনা এখানে দেখানো হল।

স্বীকৃতি: শ্রী নিখিল সরকার ও শ্রী অসিত পাল, ‘সম্পাদক উডকাট প্রিন্টস অফ্ নাইনটিন সেনচুরি, ক্যালকাটা।

বোধির প্রান্ত ছুঁয়ে যে 'বোধ'

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত সবচেয়ে সংশয়াচ্ছন্ন (Sceptic) কবি। 'ঝরাপালক' থেকে ঝরে পড়া পংক্তিসমবায় থেকে শুরু করে সেই 'বেলা অবেলা কালবেলা'র সাঁঝবেলা পর্যন্ত তাঁর সমস্ত কবিতা খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, কবিজীবনের একটি পর্ব থেকে অন্য পর্বে, একটি কবিতা থেকে অন্য কবিতায়, এমনকি একই কবিতার দুটি পৃথক চরণে কবির পদচারণা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে দ্বিধান্বিত এবং সংশয়ী। জীবনযাপনের হরেকরকম অনিশ্চয়তা, সমসাময়িক বিশ্বপরিস্থিতি, নিরবধি জিজ্ঞাসা আর তার থেকে উঠে আসা নানা দার্শনিক চিন্তা বারবার কবিকে করেছে অস্থির। তাঁর বিশ্বাস কোথাও স্থাপিত হতে না হতেই, কোনো মহৎ প্রত্যাশার কেন্দ্রে কেলাসিত হয়ে উঠতে না উঠতেই মাঝ পথে যেন খানখান হয়ে ভেঙে যায়। কবিতার পটে আঁকা আদর্শ মানুষ, আদর্শ জীবন অথবা আদর্শ আগামীর ছবিগুলিতে তাই ক্ষণেক্ষণে ঘটে গেছে বর্ণ বিপর্যয়। কিংবা বলা ভালো — বর্ণবিমিশ্রণ। জীবনের স্থির আলো বা স্থির অন্ধকার, অর্থাৎ নিরন্তর ভালো অথবা নিরঙ্কুশ মন্দের ইউনিপোলার ধারণায় যে নির্বোধ সারল্য আছে, যে করুণ চালাকি আছে, জীবনানন্দের কবিতায় তা বিশেষ প্রশ্রয় পায় নি। কবিতাভুবনে জীবনানন্দ দাশ যে যাত্রাপথ রচনা করেছেন তা যুগপৎ 'আলো-অন্ধকারে' গড়া।

ধরা যাক *বোধ* কবিতার কথা। অস্বীকার করার উপায় নেই, জীবনানন্দের কবিতাদর্শনের অন্যতম প্রধান একটি অভিজ্ঞান, এই *বোধ* । *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (প্রকাশ - ১৯৩৬ খ্রি) কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য কবিতাটির প্রথম শব্দযুগ্ম আলো-আঁধার মিলেমিশে যে ধূসরিমার সৃষ্টি হয়েছে তা জীবনানন্দীয় কাব্যকবিতার একটি বিশেষ পরিচয়বাহী বর্ণ। সংশ্লিষ্ট কবিতার সূচনা ঘটেছে এই ভাবে :-

আলো অন্ধকারে যাই — মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয় — শান্তি নয় — ভালোবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;

কবির বাচনভঙ্গিমায় এমন মনে হতে পারে, এই অনির্দেশ্য বোধ যেন স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসার সম্ভাব্য কোনো বিকল্প। এমন বিকল্প যা নাকি মানুষের চিরঈপ্সিত ঐ মানস-আশ্রয়গুলিতে উপনীত হতে কবিকে বাধা দিচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই কবিতার গভীরে গেলে দেখা যাবে স্বপ্ন শান্তির থেকে, ভালোবাসার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েই কবির আহত চেতনায় জন্ম নিয়েছে ভিন্নতর বোধ। আসলে এ এক এমন সূক্ষ্ম উদ্দীপন, যা শুধু প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন মানুষেরই নিজস্ব। 'প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত' যদি আনন্দের অন্তরালে না বাজে, তবে তো মানুষেরও সিন্ধুসারসের মতো জীবনের সফেন সমুদ্রে ঝিলিমিলি ডানা মেলে উড়ে যেতে বাধা নেই। এমন তো কতই দেখা যায় সকল মানুষ, পরিপাটি করে গোছানো মানুষ, কেমন নিষ্প্রশ্নে নির্ভার বেঁচে আছে।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে, কিসের বিনিয়োগে ঐ সব সাফল্য আর পারিপাট্য কেনা হয়েছে, সকলের না হোক কারো কারো, তা তারা মনে রাখে না, মনে রাখতে চায় না। মনকে চোখ ঠারে। এই বোধের সমস্যা তাদের জন্য নয়। তারা অনেকেই বিয়ে করা ফরসা বউকে প্রেম, আর ডাকঘরে জমানো, 'ইন্দিরা বিকাশপত্র'কে স্বপ্ন কিংবা শান্তি, ভেবে সুখে নিদ্রা যায়। আর এই সব কিছুর মধ্যেই যেন প্লেটোর প্রেত এসে কোনো কোনো ব্যতিক্রমী মানুষের কানে শুনিয়ে দিয়ে যায় অন্যতর কথা, যেমনটা ইয়েটসের কবিতায় পাই —

All his happier dreams came true
A small old house, wife, daughter, son....
'What then ?'' Sang, Plato's ghost, 'what then ?'

এবং তখনই জীবনের অন্য এক অর্থ ফুটে ওঠে, যার সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই গড়পরতা মানুষের বেঁচে থাকার বাঁধা গৎ-এর। সেই জন্যেই বিবেকী মানুষের চৈতন্যের গভীরে জেগে ওঠে বোধ। ফলস্বরূপ অস্তিত্বের রুটিনটাকে অর্থহীন মনে হয় তার। তখন —

সব কাজ তুচ্ছ হয়, — পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা — প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়
শূন্য মনে হয়।

এই শূন্যতা, বিস্বাদ, জাঁ পল সার্ত্র কথিত nothingness এর সগোত্র।

আর একটা কথা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে কেমন ছিল কবির স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসা সম্পর্কিত প্রত্যয় ? যা তিনি চেয়েও পান নি, সেই আদর্শ স্বপ্ন শান্তি প্রেমের রূপ ছিল কেমন ? আমরা জানি, *'বোধ'* কবিতায় এগুলিকে কবি নেগেট করেছেন। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখব না, কেন এই তীব্র অভিমান, এই নঞায়ন (nihilation) ? 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থটি থেকেই আমরা উদ্ধার করতে চাইব যেমন কিছু অংশ, যেখানে কবির অভীপ্সা শব্দশরীর পেয়েছে। প্রথমে *স্বপ্নের হাতে* কবিতার কিছু অংশ —

স্বপ্ন — শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে,—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে পাশে—
....
সন্ধ্যার নদীর জল, পাথরে জলের ধারা
আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
যাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন — শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি গৃহীত হবে *এই শান্তি* কবিতা থেকে।

এ জীবন কবে যেন মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে র'বে
নীল আকাশের নিচে অঘ্রাণের ভোরে এক — এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপ্সা ভোরে এ জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে
একদিন ....।

তৃতীয় উদাহরণ হিসাবে আমরা নেব একই কাব্যগ্রন্থের *প্রেম* শীর্ষক কবিতার অংশবিশেষ —

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম, — গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ বলে!

এ ভাবে গ্রহণ হয়তো কিছুটা যান্ত্রিক, তবু সামান্য হলেও উদ্ধৃত অংশগুলি কি চিনিয়ে দেয় না, জীবনানন্দ কোন আদর্শ স্বপ্ন-শান্তি প্রেম-ভালোবাসা আশা করতেন ? কী পরম মমতায় আশা করতেন ? অথচ বাস্তব অন্য স্তবমন্ত্র একেবারে একঘেয়ে কর্কশ সুরে গেয়ে গেছে এবং তার ধাক্কায় কবির কল্পনা-প্রার্থনায় রাঙানো ঐ সব স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসার মডেলগুলি একে একে সংগোপনে হয়েছে চূর্ণ। 'হৃদয়ের মাঝে' জন্মেছে ভিন্নতর বোধ। সক্রিয় হয়েছে 'মাথার ভিতরে' অর্থাৎ চেতনার ভিতরে।

এত বড়ো রূপান্তর অবশ্য একদিনে হঠাৎ হয় নি। আপনাআপনিও হয় নি। আড়ালে নিহিত ছিল আর্থসামাজিক উথালপাথাল, অশনিসংকেত। ইউরোপের বধ্যভূমিতে প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তদাগ তখনো মোছে নি, জনতার স্মৃতিতে তখনো তরতাজা মানুষের মৃগয়ায় মানুষেরই শিকার হবার সন্ত্রস্ত দিন-রাতগুলি। আর রক্তাক্ত মানবতার শুশ্রূষা শেষ হতে না হতেই ''নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল'' শোনা গেল নিভৃতে। এই মর্মান্তিক সময়কে ইউরোপীয় কবিকুল দেখেছিলেন ভয়চকিত নেত্রে। তার অসাধারণ উৎসার টি এস এলিঅট - এর *ওয়েস্ট ল্যাণ্ড (১৯২২)* এবং *হলোমেন* (১৯২৫)। বিশেষত প্রথম কাব্যগ্রন্থটি হয়ে উঠেছিল এই আর্তসময়ের বিবেক, এই যুগন্তরের ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকাশ। প্রত্যক্ষভাবে কোনো

মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের বুকে আছড়ে না পড়লেও সর্বগ্রাসী এই তাণ্ডবের বাইরে কিন্তু ছিল না কেউ। এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং আরও বেশি করে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঋণাত্মক পরিবর্তন ঘটেছিল চুপিসাড়ে। পশ্চিমি পরিভাষায় যাকে বলে 'Postwar cynicism' তা দেখা গেল অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের চিন্তন-সৃজন-রূপায়ণের জগতেও অঙ্কুরিত হয়েছে, অনেকটা পার্থেনিয়মের মতো।

জীবনানন্দ দাশের *বোধ* কবিতাটি এই শঙ্কাতুর প্রহরের সন্তান। সময়কে, জগতের এই চতুর্থ মাত্রাকে আজীবন আমাদের কবি কবিতার অক্ষরে অক্ষরে, ছন্দের অক্ষরবৃত্তে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায় — "সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো।" এবং এই সময়চেতনা — যা সর্বদা সুচেতনা হয়তো নয়, যেহেতু তা সম্ভব নয়, কিন্তু যা অবশ্যই সচেতনা — তা *বোধ* কবিতার জনন মুহূর্তেও সক্রিয় ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, আলোচ্য কবিতায় যে হতাশ্বাস শূন্যতা আছে, তার দায়ভাগী যেমন ব্যক্তি, তেমনই সমষ্টি, অর্থাৎ সমসময়ের ইতিহাস। অনেকটা অস্তিবাদীদের ভাবনার মতোই যে অসুখী চৈতন্য (Unhappy Consciousness) এবং অস্তিত্বের যন্ত্রণা এখানে কবিব্যক্তিত্বের সঙ্গী, ঠিক তার পাশাপাশি, এখানে, এই কবিতায়, যে অসূয়া ও বিবমিষা, যে নেতির নির্মাণ, তা ইনডিভিজুয়ালিটিকে ছাড়িয়ে এই চলমান শতাব্দীর এক মহাট্র্যাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী উদ্বিগ্ন অধ্যায়কে পাশ্চাত্যে বলা হয়েছে 'Age of interrogation'। শুধু প্রশ্ন, নিরুত্তরে মৌন প্রশ্নই শুধু, প্রতিকারহীন বিরুদ্ধতার নিরেট দেয়ালে মাথা কুটে মরা অজস্র অজস্র প্রশ্ন। দিকে দিকে জায়মান সাহিত্যে, বিশেষত অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে এই সব প্রশ্নের সশব্দ উন্মোচন লক্ষ করা গেছে। এবং তা মুখরিত কবিতাতেও। যেমন এই *বোধ* কবিতায় আমরা দেখব অনেক অনেক প্রশ্নচিহ্ন। শূন্য হয়ে যাওয়া এক শ্বাসরোধী পরিবেশে কবি যেন জিজ্ঞাসার পায়ে নতজানু —

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর; কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর? — শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর? — প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার! ইত্যাদি

লক্ষণীয়, এখানে এই প্রশ্নমালায় জিজ্ঞাসাই শুধু আছে, উত্তর নেই। কোন সে বোধ যা কবির সত্তার মধ্যে এভাবে সংক্রামিত হয়? যা সর্বস্থানিক, যার থেকে মুহূর্তের জন্যও কবির নিস্তার নেই। কবিতার ভাষায় —

আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে।
আমি থামি —
সে ও থেমে যায়;

এবং এই বিবিক্তি দ্রুত রূপান্তরিত হয় বিষণ্ণতায়, পুনরপি আত্মজিজ্ঞাসায় —

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রা দোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধাঁ?
আমার পথেই শুধু বাধা?

এই বোধ ঠিক হিসেবি, চতুর, সাফল্যের আরামকেদারায় উপবিষ্ট মানুষদের মাথার ভিতরে কাজ করে না। কেননা তাদের অনেকের সফলতা তো এই বোধকে, বোধের ভ্রূণকে হত্যা করেই। তাই বাস্তবে দেখা যায়, স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যাওয়া দরকারী পুরুষ কিংবা শারীরিক মেয়েরা কেমন সুখেই বেঁচে আছে। জানি না হয়তো সেই কারণেই বাইবেলের কালেও বলা হয়েছে 'Ignorance is bless', যেমন সকলেই কবি নয়, তেমন সংবেদনের সেই সূচীমুখও সকলের থাকে না। কারো কারো থাকে। তারা পৃথিবীর এই গণতান্ত্রিক মেছোহাটেও বড় একা। এ বেদনা সেই সক্রেটিসের কাল থেকেই সত্য!

মানুষ আসলে দুভাবে একাকী হয়। নির্জনতার মাঝে এবং জনতার মাঝে। না, এর মধ্যে কোনো হেঁয়ালি নেই। যখন সে পাণ্ডববর্জিত কোনো স্থানে জনবিচ্ছিন্ন, তখন তো সে একা বটেই। এই একাকীত্ব সহজবোধ্য, সংখ্যাতাত্ত্বিক। কিন্তু আরো এক ভাবে সে একাকী বোধ করে। যখন সে পরিচয়হীনের ঠেলাঠেলি ভিড়ের মাঝে বান্ধববর্জিত, তখনো......। অসাড়, অনান্তরিক একদল মানুষের মধ্যেও মানুষ ওই ভাবে ননএনটিটি হয়ে যায়। তীব্র এক একাকীত্ববোধে আক্রান্ত হয় তার সত্তা। কিয়েকেগার্দ-হুসার্ল--হাইডেগার-মার্লোপন্তি-সার্ত্রে-বাহিত অস্তিবাদী দর্শনও অনেকটা এইজাতীয় ধারণাই পোষণ করে।*

বোধ কবিতায় অতপর জীবনানন্দ যে গড্ডলিকা প্রবাহের ছবি এঁকেছেন তা জীবনের আদিতম সত্য। কিন্তু অ্যামিবার সত্য আর সচেতন মানুষের সত্য কি একটুও পৃথক নয়? চিরন্তনী পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বয়ে যাওয়া এ ধারাপাতের সঙ্গে কবি যেন একাত্ম হতে পারছেন না —

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের কিংবা যারা পৃথিবীর বীজ খেতে আসিতেছে
চ'লে
জন্ম দেবে-জন্ম দেবে বলে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না — কি?

এবং এই এষণার শেষে শোনা গেছে দীর্ঘশ্বাসদীর্ণ 'তবু আমি এমন একাকী'র মতো সিদ্ধান্ত। জলের বলের মতো এই অংশে কবি শব্দকে, বাক্যকে জড়িয়ে চলেছেন, আবার ছাড়িয়েছেন কমা-সেমিকোলন-কনজাংশন দিয়ে। বারবার পুনরাবৃত্ত জন্ম-জনন-মৃত্যুর বৃত্তপথটা এই ভাবে কুশলতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন তিনি। কেবল সন্তানধারণ আর মৈথুন ইতর প্রাণীর কাম্য হতে পারে, কিন্তু হৃদয় আর মস্তিষ্কের ব্যবহারে বিশ্বাসী মানুষের অন্তিম লক্ষ্য তা নয়। যেহেতু মানুষ সচেতন, সৃজনবুদ্ধি সম্পন্ন। সুতরাং যাতে শুধু জনসংখ্যা বাড়ে, মানুষ বাড়ে না, সেই প্রায়-পাশবিক জীবনযাপনের ছক কবিকে তৃপ্ত করে না।এবং সহজিয়া জীবনযাপনের এই মাঝারিয়ানায় মিলতে না পারার কারণেই কবির মনে হয়, তিনি একাকী!

আপাতশ্রুতিতে মনে হবে পারে, কবির গভীর এই একাকীত্ববোধ বুঝি কোনো ব্যক্তিগত বিলাস, বুদ্ধিজীবীসুলভ ঊন্নাসিকতা। কিন্তু তা নয়। এই কবিতায় দেখা গেছে, শ্রমের সহজাত মূল্যকে, জীবনধারণের সহজ চাহিদাকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন না। এমনকি চেষ্টা করেন তার অংশীদার হতে। স্মৃতিচারণের সুরে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করেন, প্রার্থিত উত্তরের অনুচ্চার ধরনে বোঝা যায়, যা মূলত ইতিবাচক —

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌তিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি।

অনেকগুলি জিজ্ঞাসার পর শেষবাক্যে আর কোনো প্রশ্ন নেই। বাক্যটি অ্যাফারমেটিভ যা পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলির হ্যাঁ-বাচক চরিত্রকেই কনফার্ম করে।

তবু কেন তিনি এমন একাকী? সেকথা ভেঙে বলতেই যেন কবিতার এই পর্যায় থেকে কবিতার চলাচলে বাড়তি একটা মাত্রা লক্ষ করা যায়। কবি বলেন —

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;
আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চলে গেছে — যখন ডেকেছি বারেবারে
ভালোবেসে তারে;

বুঝতে অসুবিধা হয় না, কবির অভিমানী একাকীত্বের সবটা না হলেও একটা প্রধান কারণ প্রেমহীনতা। *বোধ* কবিতার সূচনা অংশে কবি স্বপ্ন ও শান্তির মতো ভালোবাসা ব্যতিরিক্ত এক অনতিস্পষ্ট বোধের অন্তর্লীন সক্রিয়তায় বিহ্বল হয়েছিলেন। সেই আভাস এখানে যেন ভাষা পেল। প্রেমের পরিবর্তে প্রতারণা, অপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা, প্রার্থনার পরিবর্তে ঘৃণা যে পৃথিবীর স্থায়ী অভিভব, সেখানে, সেই গভীর নীলাভতম যন্ত্রণার জগতে কবিরা সুখী হতে পারে না। জীবনানন্দের তাৎপর্যপূর্ণ শব্দচয়ন আলোচ্য অংশটিকে দ্যোতনাঘন করেছে। দেখা গেল, সুরঞ্জনা-সুচেতনা-সবিতা-শঙ্খমালা-সুদর্শনা-শ্যামলী অথবা বনলতার মতো কোনো নামবাচক বিশেষ্য নয়, এখানে ব্যবহৃত হল সর্বনাম — সে। যেন ব্যক্তিগত বিষয়ের আব্রু রক্ষার জন্যই কবি সর্বনামের আড়াল টেনে দিতে চাইলেন সেই অনামা নামের মুখে। খুলে বলতে গিয়েও যেন খোলসে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, হয়তো বা "নিজেরই মুদ্রাদোষে"। কিন্তু লক্ষ করা গেল, ঐ সর্বনামধারিণীর প্রতি কবি নারী কিংবা রমণী অথবা তাঁর প্রিয় শব্দ মানুষী জাতীয় কোনো মসৃণ সম্বোধন ব্যবহার করলেন না, উচ্চারণ করলেন জুগুপ্সা জাগানো শব্দ — মেয়েমানুষ। এমন শব্দ আমরা সাধারণত সভ্যসমাজে কোনো শ্রদ্ধাভাজন মহিলা সম্পর্কে ব্যবহার করি না। অথচ কবি সচেতনভাবে তিনবার 'মেয়েমানুষেরে' ব্যবহার করে তাঁর সঞ্চিত ঘৃণাকে, এমনকি ঐ মহিলার স্বভাবকে নিপুণদক্ষতায় প্রকাশ করেছেন।

"তবুও সাধনা ছিল একদিন — এই ভালোবাসা"

— আক্ষেপ করেছেন কবি। যা ছিল মনোনিবেশের, আত্মনিয়োগের লক্ষ্য, সেই ভালোবাসা বিপরীত সময়ের চাপে হয়ে গেল কবির কাছেই 'ধুলো আর কাদা'। এবং বিকৃতির এই ছিন্নমস্তা রূপ ক্রমশই যেন তাঁকে নিজস্ব নির্জনে নিয়ে গেল। ভোঁতা কিছু স্নায়বিক-শারীরিক-মানসিক ঘটনাক্রম যে সমাজজীবনে সুখে বাঁচার গ্যারান্টি দেয়, তা কবির অসহ্য হল। সেই মননরিক্ত, স্পর্শকাতরতাহীন যূথচারিতার থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি যেন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার নিগড়ে নিজেকে বাঁধতে চাইলেন। এই বলে —

আমি সব দেবতারে ছেড়ে,
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে ;
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।

এই আত্মশরণ (আদর্শ পরিবেশে) কখনোই কবির অভিপ্রেত ছিল না বোঝা যায় পরবর্তী অংশে। সেখানে তিনি স্বপ্নের ঘোর লাগা স্বরে উচ্চারণ করেছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনো দিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনো দিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনো দিন!

কিন্তু স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই। আদর্শ শুধুই আদর্শ। সে সব অপ্রাপণীয়। বাস্তবে যা পাওয়া যায়, তা হল —

সেই কুঁজ — গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা — পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
— সেই সব।।

কবিতার শেষাংশে এই অসুস্থতা আর বিকৃতির ছবি, এই অচরিতার্থতা, সার্ত্রের 'Angst' -কে মনে করিয়ে দেয়। এক ব্যভিচারী প্রহরে যখন মানবহৃদয়ও শসা কিংবা চালকুমড়োর মতো বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে গেছে, অথবা সঠিক ক্রেতার অভাবে তাও হয়ে উঠেছে নষ্ট, পচা জঞ্জাল — সেই কালবেলায়, কবি স্বয়ং নৈরাশ্যের নৈমিষারণ্যে অজ্ঞাতবাসকেই সময়োচিত মনে করেছেন। তাই এর পর আর কোনো শব্দ নেই। বাক্য নেই। কবিতার যবনিকা নেমেছে চেতনামথিত এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে। এতদূর হতাশ অবসান জীবনানন্দের খুব বেশি কবিতায় দেখা যায় না।

এত ক্ষয় ও ক্ষরণ সত্ত্বেও *বোধ* কবিতাটিকে অবক্ষয়ী বিশেষণে দূরে সরিয়ে রাখা কবিতা-পিপাসুদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, সেক্ষেত্রে আমরা জীবনানন্দের একটি পর্যায়ের কবিতাদর্শনকেই দূরে সরিয়ে রাখব। যে একাকীত্ব আধুনিক সচেতনজনের নিশ্চিত নেমেসিস, অনেক বেদনার মূল্যে তাকে বুঝেছেন কবি। কিন্তু কোথাও তাকে অযথা মহিমান্বিত করেন নি। অন্তত এ কবিতায় বরং যা কিছু ঘৃণ্য, তাকে ঘৃণাই করেছেন, ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। শুধু যা করেন নি, তা হল ভাবের ঘরে চুরি। মানবিক ক্ষতস্থানগুলিকে আড়াল না করে তাকে উন্মোচন করেছেন সুমিত সাহসিকতায়। অনর্থক নৈরাশ্যের কথায় মানুষকে বিচলিত করা অথবা অহেতুক আশার কথায় তাকে ঘুম পাড়ানো — কোনোটাই যথার্থ কবির কাজ নয়। তাঁর কাজ শুধুই সত্য উচ্চারণ। বিশ্বাস ও জ্ঞানের সত্য, অনুভূতি এবং অনুকম্পার সত্য। *'বোধ'* কবিতার বর্ণেবর্ণে আমরা সেই সত্যের ধূসর মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করি। এখানেই সংশ্লিষ্ট কবিতাটির অসাধারণত্ব।

কবিতার মতো সাবজেকটিভ ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত হতে পারে না। হবার কথাও নয়। মেধা রুচি এবং পাঠ অভ্যাস অনুযায়ী একই কবিতার একাধিক বিকল্প পাঠমূল্য ও অর্থ থাকতে পারে, এই কথাটুকু মেনে নিলে অনেক অনাবশ্যক বিতর্ক থেকে মুক্ত থাকা যায়। বোধ এর মতো বহুস্তর ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবিতাটিকে আমরা এই ভাবে দেখতে চেয়েছি। দেখেছি কবি যেন হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে চলেছেন অন্‌টোলজিক্যাল কিছু জিজ্ঞাসাকে সঙ্গী করে। আলো অন্ধকারে।

আলো অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতোবার শুনিয়াছি আমি।''

অথবা *প্রেম* কবিতায় —

''..... গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ বলে।''

এমন স্পষ্ট পাশাপাশি উল্লিখিত না হলেও *মৃত্যুর আগে* কবিতাতেও ধূসর প্রকাশ আছে তার। যেমন এই সব অংশে 'লাইট অ্যাণ্ড শেড' নিরূপিত হয়েছে অন্যতর তাৎপর্য —

''দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা।'' ইত্যাদি

২. কবি W. B Yeats,এর last poems (1936) কাব্যগ্রন্থের *What then* কবিতার অংশবিশেষ গৃহীত হয়েছে।

৩. জাঁ পল সার্ত্রের দার্শনিক গ্রন্থ *Being and Nothingness* একদা অস্তিবাদী দর্শনে জোয়ার এনেছিল। তাঁর Nothingness এর জ্ঞানতাত্ত্বিক Epistemological ব্যাখ্যা এই রকম —

''Nothingness was a kind of gap or separation which lay between a man and the world, or rather between a man's consciousness and the world of objects of which he was conscious''.

From *Existentialism* by Mary Warnock, Page 93 Oxford University Press.

৪. বিশেষত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ এবং অব্যবহিত পরে সমর সেনের কবিতার মধ্যে এই 'নিরাশাকরোজ্জ্বল' জীবনের ছবি এই সময় দেখা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থের *জীবন* কবিতাগুচ্ছের উল্লেখ করতে চাই। জীবনের থেকে যেখানে মৃত্যুর আবাহন, আশার তুলনায় যেখানে নৈরাশ্যে অবগাহন কম নয়। মোট চৌত্রিশটা টুকরো কবিতায় জীবনের যে 'চৌত্রিশা' স্তব কবি করেছেন তা এই রকম—

''যক্ষ্মা রুগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন —
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!'' ইত্যাদি

৫. *কবিতার কথা* প্রবন্ধগ্রন্থের *কবিতা প্রসঙ্গে* নামক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত অংশ প্রকাশক, - সিগনেট, পৃষ্ঠা - ৪৩

৬. কার্লমার্কস বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদিকা শ্রমজীবীর বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলেন। অস্তিবাদীরাও বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা বলেছেন। একটু অন্য অর্থে। তাঁদের ধারণা —

''How, then, do existentialists use the concept of alienation? Apart from my own conscious being, all else, they say, is otherness, from which I am estranged''.

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *দশমী* কাব্যগ্রন্থের *প্রতীক্ষা* কবিতায় যেন এই কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে —

''অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।''

৭. প্রায় অনুরূপ কথা আর দীর্ঘশ্বাস মোচন আমরা শুনতে পাব সমর সেনের *মেঘদূত* কবিতায় —

''হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?''

উল্লেখপঞ্জী

১. জীবনানন্দের কবিতায় 'আলো অন্ধকার' বার বার আবৃত্তির মতো এসেছে। *বোধ* ছাড়াও অন্যত্র। যেমন ১৩৩৩ কবিতায়

১৩৫০ এর মন্বন্তর, বিক্রমপুর ঢাকা

চতুরঙ্গ মার্চ সংখ্যায় (১৯৯২) শ্রী অশোক মিত্র মহাশয়ের *১৩৫০ এর মন্বন্তর, বিক্রমপুর, ঢাকা*, শীর্ষক অনবদ্য লেখাটি পড়ে আমার ছেলেবেলার দু-একটি কথা মনে পড়ে গেল।

১৩৫০-এর মন্বন্তরের সময় আমি ঢাকায় নবকুমার ইনস্‌টিট্যুটের ক্লাস সেভেন-এ পড়তাম। বাড়ির কাছেই স্কুল। হেঁটে যাতায়াত করতাম। আমাদের স্কুলের সামনে একটি বড়ো ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তার দক্ষিণ পাড়ে কতগুলি বড়ো বড়ো গাছ ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত লোকেরা পরিশ্রান্ত হয়ে সে সব গাছতলায় বিশ্রাম নিতেন।

সে-সময়ের এক বীভৎস ছবি এখনও আমার চোখে ভাসে ও দুঃস্বপ্নে দেখি। একদিন সকালে স্কুল যাবার সময় দেখি যে একটি বড়ো গাছের তলায় এক মা তার কোলের শিশুকে নিয়ে বসে বসে হাঁপাচ্ছে। মা-র শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই। শুধু কংকালের উপর খড়ি উঠা রুক্ষ ফাটা চামড়া দিয়ে ঢাকা। গায়ে শতছিন্ন একটা নোংরা থান। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে গায়ে কয়েকটা ঘা। কতগুলি বড়ো মাছি ভন ভন করে ঘুরছে। আর বাচ্চাটি আরও ভয়ংকর দেখতে। শরীরের তুলনায় বিরাট মাথা। হাত-পাগুলি খুব সরু সরু। বুকের পাঁজর সব কটা দেখা যাচ্ছে তবে পেটটা ফুলো। সামনে একটা কলাইয়ের সাদা ভাঙা থালা পড়ে আছে। তাতে কিছু নেই।

আমার বাড়ি থেকে কড়া নিষেধ ছিল যেন ক্ষুধার্ত লোকজনের কাছে না যাই। স্কুলের ছেলেদের কাছ থেকে টিফিন বাক্স বা পকেট থেকে দু-এক আনা পয়সা কেড়ে নেবার কয়েটা ঘটনা আগে হয়ে গেছে। কিন্তু এই মা ও তার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে মনে হল ওরা শুধু যে কদিন খায় নি তা নয় এখন ভিক্ষা চাইবার জন্য হেঁটে বেড়াবার বা উচুঁ স্বরে চিৎকার করার ক্ষমতাও নেই। আমার সঙ্গে টিফিন ছিল দুটো হাতে গড়া রুটি ও অল্প আখের গুড়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে যখন মনে হল কেউ আমাকে দেখছে না তখন একটা রুটি আর খানিকটা গুড় বার করে চট করে থালার উপর রেখে স্কুলের দিকে পা বাড়ালাম। কাছে যেতেই এক তীব্র দুর্গন্ধ নাকে এল। গা গুলিয়ে উঠেছিল। স্কুল যেতে যেতে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখি যে মা-টি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যখন কাছে গিয়েছিলাম তখনও কিছু কথা বলে নি। তাকিয়েই ছিল। বাচ্চাটি ক্ষীণ স্বরে একটা আওয়াজ করছিল।

বিকেল সোয়া চারটের সময় ছুটি। ফেরার পথে গাছের কাছে গিয়ে দেখি মা দুমড়ে শুয়ে আছে স্থির হয়ে — মারা গেছে। আর বাচ্চাটি মার বুকের কাছে খুব ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে — কিন্তু সকালের সেই ক্ষীণ স্বরটিও আর নেই। থালার উপর আধখানার মতো রুটি পড়ে রয়েছে আর গুড়ের উপরও চারিদিকে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম ডাক শুনে : 'ওখানে থাইকো না — বাসায় যাও গিয়া।' দেখি দূরে চায়ের দোকানী কথাগুলি বলছেন। ঐ দোকানের পাশ দিয়েই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। দোকানের কাছে পৌঁছতেই ভদ্রলোকটি বল্লেন, 'তোমার রুটি খাইতে-খাইতেই হে গেল গিয়া, এ অবস্থায় শুকনা রুটি খাইতে পারে ? তাও তুমি দিলা বইল্যা মরণের আগে রুটি গুড় খাইয়া গেল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম বাচ্চাটার কী হবে ? উত্তর হল 'তুমি যাও গিয়া, হে দ্যাখুমওনে।' আমি অনুরোধ করলাম বাড়িতে কিছু না বলতে। ভদ্রলোকটি তখন এ আর পির ভলান্টিয়ার। আমার ধারণা ছিল উনি কেউকেটা লোক। কাজেই উনি নিশ্চয় কিছু করবেন বাচ্চাটিকে বাঁচাবার জন্য এই ভেবে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরের দিন স্কুলে যাবার পথে দেখি গাছতলায় মা-ও নেই বাচ্চাও নেই। বুকটা কেমন ধক্ করে উঠল। পুকুরপাড়ে দেখলাম সেই ভাঙা সাদা থালা মালিকহীন হয়ে পড়ে আছে।

কিছুদিন পরে এক শনিবার হাফ-হলিডে। দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় দেখি প্রধান শিক্ষকের অফিসের সামনে এক মিটিঙের আয়োজন চলছে। শুনলাম ঢাকার জেলা জজ শ্রী জে সি দে আই সি এস আসবেন ও-অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভা করার জন্য দুর্ভিক্ষত্রাণের ব্যাপারে। পরে জানলাম সভায় ঠিক হয়েছে যে সরকারী সাহায্য না আসা পর্যন্ত সবাযের কাছ থেকে চাল-ডাল চেয়ে নিয়ে সপ্তাহে তিন দিন একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হবে বুভুক্ষু আর্তদের। স্কুলের খেলার মাঠের শেষে চালাঘরে রান্না হবে আর মাঠে বসিয়ে খাওয়ানো হবে।

বাড়িতে তখন বেশ বিতর্ক হচ্ছে চাল দেওয়া হবে কিনা, এ-নিয়ে। অকাল শুরু হবার সময় যখন বালাম চালের দাম সবে মাত্র বাড়তে শুরু করে মন প্রতি ২১/২ টাকা থেকে ৫/৬ টাকায় উঠেছে তখন এক বন্ধু বাবাকে জোর করে দু-বস্তা চাল কিনিয়ে দেন। তারপরেই চাল ঢাকার বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায় এবং দাম বাড়তে বাড়তে মন প্রতি ৫০/৬০ টাকার ওপর উঠে যায়। বাজারে চাল নেই। র‍্যাশন শুরু হয় নি। ঐ দু-বস্তা চালই আমাদের সংসারে একমাত্র ভরসা। তাছাড়া পাড়ার দু-এক পরিবার যাঁরা সময় মতো চাল সংগ্রহ করতে পারেন নি তাঁরাও আমাদের এই চালের উপর নির্ভর করতেন। সুতরাং এ-অবস্থায় অবশিষ্ট চাল থেকে লঙ্গরখানায় চাল দেওয়া উচিত হবে কি না তা নিয়েই বিতর্ক।

কিন্তু প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত লোকেদের হাহাকার শুনে খাওয়াও যায় না অথচ কিছু করারও থাকে না। এ-অবস্থায় বাবা ঠিক করলেন যে লঙ্গরখানায় চাল দেওয়াই উচিত হবে। ভিক্ষার্থীদেরও বলা যাবে লঙ্গরখানায় যেতে যেখানে গরম খিচুড়ি খেতে পাবে পরিবারের সবাইকে নিয়ে। প্রথম কিস্তির ২/২১/২ সের চাল এবং সের খানেক ডাল আমিই নিয়ে যেতে পারতাম স্কুলে। কিন্তু চাল তখন এত মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী যে বাড়ির রান্নার লোকটিকে দেওয়া হল চাল নিয়ে যাবার জন্য যাতে কেউ কেড়ে না নিতে পারে রাস্তায়। স্কুলের অফিসে চাল-ডাল নিয়ে যেতেই দেখি সহকারী প্রধান শিক্ষক নিজেই দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে নিজের হাতে রসিদ লিখে দিলেন ২১/২ সের চাল ও ১সের ক-ছটাক ডাল।

সেদিন টিফিনের সময় আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠানো হল প্রধান শিক্ষকের অফিসে। খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম না জানি কি অন্যায় করেছি অজান্তে যার জন্য হয়তো শাস্তি পেতে হবে। ঘরে ঢুকে দেখি প্রধান শিক্ষক ছাড়া রয়েছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক ও আরও দু-তিন জন শিক্ষক। সবাই সমবেত হবার পর প্রধান শিক্ষক জানালেন যে আমাদের মতো যারা ভাত খেয়ে স্কুলে আসে তাদের নিয়ে এক ছোটো ভলান্টিয়ার কর্মীদল গঠন করবেন লঙ্গর পরিচালনার জন্য। আরও বললেন যে সব সংসারেই চাল বাড়ন্ত — কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁরা আর্ত সেবার জন্য স্বেচ্ছায় চাল দিয়েছেন — সে চালের এক দানাও যেন অপচয় না হয় বা অপাত্রে না যায়। খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন যে তিনি জানেন যে স্কুলে বহু ছাত্র আছে যারা দিনের পর দিন কচু, কুমড়ো, শাক ইত্যাদি খেয়ে স্কুলে আসে। যদিও তিনি কাউকেই অবিশ্বাস করছেন না তবুও তাদের অনেকেরই গরম খিচুড়ি দেখে লোভ সম্বরণ করা মুশকিল হতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে অনেক কর্মঠ ছেলেদের বাদ দিয়ে তিনি আমাদের দিয়ে কর্মীদল গঠন করছেন।

আমার সঙ্গে আমারই ক্লাসের একটি মুসলমান ছেলে কাজ করত লঙ্গরখানায়, তার নাম আমি আজ মনে করতে পারছি না। সে একদিন কাজ করতে করতে বললে যে তাদের গ্রামের নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছে শুনেছে যে মুন্সীগঞ্জের এক হাকিম খুব ভালো কাজ করছেন দুর্ভিক্ষ ত্রাণে। 'হাকিম সাহেব হিন্দু হইলে কি হইবো, হিন্দু ব্যাপারীগো আড়ত, দোকান ভাইঙ্গা ঢুইক্যা চাউল ডাইল লইয়া আইস্যা আমাগো — শুধু আমাগো ক্যান হকলের মধ্য বিলাইয়া দিতাছেন। হে হাকিমও লঙ্গর খুলছেন অনেকগুলা। হকলেই তারে ধইন্য ধইন্য করতাসে।'

কে সে হাকিম, কী তাঁর নাম সে সব তখন আর তাকে জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু তৎকালীন ঢাকায় রাজনীতির দিনে আমার কিশোর মুসলমান সহপাঠীকে অবাক করেছিল হিন্দু হয়েও হিন্দুদের দোকান থেকে চাল-ডাল কেড়ে নিয়ে ন্যায্য মূল্যে মুসলমান-হিন্দু ভেদ না করে সবাইয়ের কাছে বিতরণ করায়। সেই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় এটা যে হতে পারে সে ছেলেটি বা তার আপনজনেরা ভাবতেই পারে নি। তাই সে শত মুখে সে হাকিমের এত প্রশংসা করল।

বহুকাল পরে ৭০ দশকের শেষার্ধে শ্রী অশোক মিত্র তখন আই সি এস থেকে অবসর নিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করছেন। একদিন শনিবার বিকালে ওঁর চাণক্যপুরীর দোতলার ফ্ল্যাটের বিরাট বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বাংলাদেশ সফর ও মুন্সীগঞ্জে গিয়ে পুরনো দিনের লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কথা বলছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম যে মন্বন্তরের সময় কি উনি মুন্সীগঞ্জের এস ডি ও ছিলেন ? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ সে সময় যাঁরা জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করে আর্তের সেবায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন উনি তাঁদের কথাই বলছেন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। মনে ভেসে এল আমার সুদূর কৈশোর। সেই কিশোর বন্ধুর ঝাপসা মুখ। সেই কদর্য দূষিত সাম্প্রদায়িক বাতাবরণে সে অবাক হয়েছিল যে হাকিমের সহৃদয়তা, মানবিকতা, নির্ভীকতা ও কর্মদক্ষতার বিচিত্র উপাখ্যান শুনে, আজ জানলাম তিনিই শ্রী অশোক মিত্র।

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮ সি, ব্লক - ডি, নিউ আলিপুর
কলকাতা — ৭০০ ০৫৩

দি মারজিন্যাল মেন-এর অনেক আগে লেখা হয় *উদ্বাস্তু*

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ১ (মে ১৯৯২) সংখ্যাটি মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। শ্রী শিবনারায়ণ রায় ও শ্রী সুকান্ত চৌধুরী লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দুটি তথ্যসমৃদ্ধ, চিন্তাকর্ষী। এ-দুটি নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে। এ মুহূর্তে তা না করে শ্রী জ্যোতির্ময় বসু লিখিত 'গ্রন্থ সমালোচনা'য় যাই। 'পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু ইতিবৃত্ত' শিরোনামে তিনি শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রণীত *'The Marginal Men'* গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন 'বইটি অসাধারণ' (পৃঃ ৫৪)। সেই সঙ্গে লিখেছেন, 'তুলনীয় আর কিছু এ পর্যন্ত ইংরেজি বা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' এই বিষয়ে বিশ বছর পূর্বে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় — *উদ্বাস্তু*। লেখক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস। প্রকাশক — সাহিত্য সংসদের পক্ষে মহেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭০। পরবর্তীকালে কোনো সংস্করণ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

ইতিহাসের খাতিরে এটিকেই বাঙালি উদ্বাস্তু সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ বলে গ্রহণ করা উচিত। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে, 'বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উদার হৃদয়ের অধিকারী বলে সুবিদিত। প্রথম থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মুখ্য-সচিব ও মহাধ্যক্ষ হিসাবে। তাই তাঁর স্মৃতিকথা সম্বলিত এই বইটিতে একাধারে যেমন অগণিত মানুষের দুভোর্গের ইতিকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তেমনি অসীম মনোবল নিয়ে সমস্যা সমাধানের যে দুর্জয় প্রচেষ্টা হয়েছিল, তারও ইতিহাস বহুলাংশে রচিত হয়েছে। এই বই রচনার জন্য বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে তিনি ধন্যবাদার্হ হবেন, আশা করি। পরবর্তীকালে এই বই বাঙালির ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।'

প্রকাশকের এই দাবি অবশ্য স্বীকার্য।

কোনো অত্যুক্তি না করে বলা যায়, ৩৪৪ পৃষ্ঠা- সম্বলিত এই বইখানি অসাধারণ গ্রন্থ। ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত এই গ্রন্থে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যার নির্ভরযোগ্য ছবি ও নিপুণ বিশ্লেষণ এখানে পাই।

চতুরঙ্গ মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী অশোক মিত্রের (আই সি এস অবসরপ্রাপ্ত) নিবন্ধে ('১৩৫০-এর মন্বন্তর : বিক্রমপুর ও ঢাকা') যে তথ্যনির্ভর করুণ নিপুণ হৃদয়বিদারক চিত্তাকর্ষী বিবরণ পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। — 'সেই একান্ত দুর্দশার দিনে প্রশাসনিক কর্মচারী হিসাবে আমি পশ্চিম বাঙলার উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে আমি দীর্ঘকাল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের সচিব এবং মহাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলাম। সেই সময়ে আমি এক অনন্য-সাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম যে কোন বিশেষ মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। অগণিত মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার সঙ্গে সহকর্মীদের নিয়ে যে অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল তা যেমন একদিকে একান্ত দুঃখময়, তেমনি অপরদিকে আর্তসেবায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্তে নানাক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল।

'পশ্চিম বাঙলার ইতিহাসের সেই একান্ত করুণ অথচ রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ইতিহাস ভবিষ্যতে কোনদিন লিপিবদ্ধ হবে কিনা জানি না। সরকারী দপ্তরে তার যে প্রমাণপত্র আছে তা হয়তো একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্বন্ধে বিবরণ উত্তরকালের জন্য রক্ষিত হওয়া উচিত।'

এই বোধ থেকেই হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বইটি লিখেছেন। প্রশাসনেরই একজন হয়ে দিল্লি-কলকাতার রাজনীতি ও মানসিকতার ভিতরের খবর ও নির্দেশ বিচার করে এই সুবিপুল জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে।

উদ্বাস্তু-সমস্যার বিশালতা, চারিত্র, মানসিকতা, এবং তার সমাধানে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার একটি পুরো ছবি এই গ্রন্থে পাই। উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে এমন হৃদয়বিদারক চিত্তাকর্ষী গ্রন্থ আর পড়ি নি। পরিশিষ্টে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত চারটি সারণী আছে — (ক) ৩১.১২.৫৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সালওয়ারী মোট সংখ্যা, (খ) আশ্রয় শিবিরে স্থাপিত উদ্বাস্তুদের সালওয়ারী মোট সংখ্যা, (গ) আশ্রয় শিবিরে থেকে পুনর্বাসন-স্থানে প্রেরিত উদ্বাস্তুদের

সালওয়ারী সংখ্যা, (ঘ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জেলাওয়ারী সংখ্যা।

বাঙালি উদ্বাস্তুদের ইতিহাসচর্চায় এ বই অপরিহার্য।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নারী পুরুষের বুদ্ধির তারতম্য

সুদীর্ঘকালের চতুরঙ্গ পাঠের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আশা করেছিলাম অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী দেবব্রত ঘোষের নিবন্ধটি সম্বন্ধে এই পত্রিকার বিদগ্ধ পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ না কেউ সুচিন্তিত মতামত জানাবেন। কেননা লেখাটির যা বিষয়বস্তু বর্তমান যুগে তার কোনো প্রাসঙ্গিকতাই আর নেই। নারী পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ে ছায়াচ্ছন্নতা ছিল বহু-বহু যুগ আগে। এখন আর নেই। তার পরিবর্তে নারী পুরুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। হালে এসব নিয়ে 'গবেষণা' হচ্ছে বিস্তর। কত যে নিবন্ধ রচিত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

নারী বুদ্ধিহীনা — এটি বহু যুগের সমাজসৃষ্ট ধারণা। নারীর কম ওজনের মগজই যে এর জন্য দায়ী — এটি স্পষ্ট করে খুব সম্ভবত প্রথম উচ্চারণ করেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু 'বিজ্ঞান সম্মতভাবে' প্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু হয় উনিশ শতকে। পল ব্রোকা (কোনো মতেই তিনি শারীরবিদ নন। শল্য চিকিৎসক, নৃতত্ত্ববিদ। ফ্রান্সে Physical Anthropology গবেষণার পুরোধা বিজ্ঞানী) এর পুরোধা ছিলেন তা অবশ্যস্বীকার্য। যে তথাকথিত 'বিজ্ঞান'-এর সাহায্যে নারীকে বুদ্ধিহীনা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় তাকে বলা যেতে পারে Craniology (Phrenology-ও ছিল এর দোসর)।

যাই হোক, এই শতাব্দীর প্রথম পাদে আর্থ-সামাজিক কারণে নারীকে ব্যাপক আকারে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে হয়। Man for the field and woman for the hearth — এমন অবস্থার পরিবর্তন হয়। Hearth ছেড়ে নারীকেও field-এ পুরুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে হয়। ফলত নারীকে আর বুদ্ধিতে খাটো বলার উপায় থাকে না। বহুযুগের আরোপিত ধারণাটির অবসান হয়। Craniology/Phrenology গুরুত্ব হারায়। সুতরাং একথা বলা যায় যে বিজ্ঞানের কোনো অমোঘ আবিষ্কারের জন্য নয়, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণের জন্যই নারী পুরুষের বুদ্ধির তারতম্যের কল্পনির্মাণটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেউ কেউ গুরুত্ব দিতে চান না। যেমন Stephanie Shields বা Stephan J. Gould. এঁরা মনে করেন আই কিউ অভীক্ষা শুরু হবার পর মগজ মাপামাপির অবসান হয়েছে। ফলত, কবরস্থ হয়েছে নারী পুরুষের বুদ্ধির তারতম্যের প্রসঙ্গটি। এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। আই কিউ অভীক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে লৈঙ্গিক পার্থক্য কোনো দিনই আই কিউতে সূচিত হয় নি (এ প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত হয়েছে)।

অর্থাৎ নিছক বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, পুরুষ বুদ্ধিধর আর নারী বুদ্ধিহীনা — বিগত বেশ কয়েক দশকে এমন কথা আর উচ্চারিত হয় না। এমনকি দৈনিক পত্রিকার পপুলার লেখায়ও (আনন্দবাজার : ৯.৬.৯১ : নারী বনাম পুরুষ) নারী পুরুষের মানসিক কাঠামোর আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বিরূপতার প্রশ্নটি তোলাই হয় না। অথচ সেটিই শ্রীঘোষের আলোচনার উপজীব্য বিষয়।

কিন্তু তা বলে 'পুরুষকে সুপিরিয়র নারীকে ইনফিরিয়র' প্রতিপন্ন করার খামতি থেকে গেছে, তা আমরা বলছি না। সামাজিক কল্পনির্মাণ বা আরোপিত ধারণায় সময়ের ব্যবধানে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে যে পুস্তকটির উল্লেখ করতেই হবে, তা হল : *The Psychology of Sex Differences* (যুগ্ম লেখক : Eleanor E.Maccoby এবং Carol N. Jacklin)। এদের মতে নারী-পুরুষের যৌন দ্বিরূপতায় যে পার্থক্যগুলো 'fairly established' (Sic). তা হল : নারী বাচনিকভাবে দক্ষ, পুরুষের রয়েছে চাক্ষুষ-দৈশিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলেই, পুরুষরা স্থপতি, বাস্তুশিল্পী বা শিল্পী হবার উপযুক্ত। আর পুরুষরা যে গণিতে পারঙ্গম, aggressive,তা কি আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? যাই হোক, এই সাড়া-জাগানো দিশারি পুস্তকটির অনুরূপ বিস্তর লেখালিখি, অজস্র গবেষণার নির্যাস কিন্তু একই।

মানসিক কাঠামোয় এই যে যৌন দ্বিরূপতা — তা

অমোঘ অপরিবর্তনশীল। কেননা এসবই সহজাত — অর্থাৎ Biologycally determined. এই কারণে 'একই শিক্ষা ও সুযোগ পেলেও নারী রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ার দলে। এই যৌন দ্বিরূপতা নারী পুরুষের বাম ও দক্ষিণ মস্তিষ্কের অসম বিকাশের (যাকে বলা হয় Lateralization বা পার্শ্বায়ন) ফলে জাত বলে এঁরা মনে করেন। কারো কারো মতে হরমোন এই পার্শ্বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (*The Inevitability of Patriarchy*: Steven Goldberg)।

দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে নারী পুরুষের সামাজিক অসাম্যকে 'বিজ্ঞান সম্মতভাবে' প্রতিষ্ঠা দিতে এগিয়ে এসেছে 'মস্তিষ্কের অসম বিকাশের' তত্ত্ব। মস্তিষ্কের খানাখন্দ-অলিগলির কোষপুঞ্জের দ্বিরূপতা তাই খোঁজা চলেছে বিরামহীনভাবে। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেবার মতো সামাজিক কল্পনির্মাণের পিছু নিয়েছে বিজ্ঞান। নারীর পক্ষে বিজ্ঞানের গবেষণাগার এখনও কেন 'Chilly environment', প্রশাসনে নীতি নির্ধারণে ও সামাজিক কর্তৃত্বকারীর ভূমিকায় আজও কেন নারী astronomical figure — এসবের পেছনে রয়েছে বিস্তর আর্থ-সামাজিক কারণ। এসব তো সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, জীববিজ্ঞানের নয়। কিন্তু জীববিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া তো নারীকে সহজাতভাবে ইনফিরিয়র প্রতিপন্ন করা যাবে না। তাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ সমস্ত প্রসঙ্গকে টেনে আনা হয়েছে জীববিজ্ঞানের আঙিনায়। আমেরিকার Harry Frank Guggenhein Foundation তো একসময় বছরে আধ লক্ষ ডলার খরচ করত পুরুষকে dominant, aggressive আর Violent প্রতিপন্ন করতে।

কিন্তু তাই, বলে মস্তিষ্কে যৌন দ্বিরূপতা নেই — তা আমরা বলছি না। কিন্তু তাকে লৈঙ্গিক পার্থক্য থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। শ্রীঘোষ কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন।

প্রসঙ্গ : গেদ্দেস - ডারউইন

এ বিষয়ে প্রথমেই যে কথাটি উল্লেখ্য তা হল, লেখক গেদ্দেসের বক্তব্য বলে যা বলেছেন তা গেদ্দেসের একার বক্তব্য নয়। উক্তি কটি নেওয়া হয়েছে *The Evolution of Sex* পুস্তক থেকে। এটির যৌথ লেখক গেদ্দেস এবং তাঁর ছাত্র J. Arthur Thomson. কমিউনিসট ইশতেহার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে মার্কসের বক্তব্য বলা যে ধরনের ভ্রান্তি, এও তার সমতুল্য ভ্রান্তি। প্রসঙ্গত জানাই থমসনও যথেষ্ট কৃতী বিজ্ঞানী। গেদ্দেসের সঙ্গে যৌথভাবে গোটা পাঁচেক গ্রন্থ রচনা করলেও এককভাবে তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Darwinism and Human Life* এবং *Heredity*.

গেদ্দেস-থমসনের Katabolic - Anabolic ধারণা 'ডারউইনি (Sic) ধারণাকে বৈজ্ঞানিক শব্দ ভাণ্ডারে সাজিয়ে চকচকে করে একটা গ্রাহ্য রূপ দেবার চেষ্টা' — এ অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ বিষয়ে তাঁরা স্পষ্টতই ঋণ স্বীকার করেছেন W K Brooks-এর কাছে। আর তাঁদের General Protoplasm-র তত্ত্বে Weismann-র *Continuity of the germ-plasm*-এর প্রভাব তো সুস্পষ্ট, ডারউইনের নয়। এখানে উল্লেখ দরকার যে আশি-র দশকে ইংল্যান্ডে Weismann যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন। তার প্রথম দিককার রচনা তখন অনূদিত হয়ে প্রকাশিতও হয়েছিল।

ডারউইন প্রসঙ্গে দুটি কথা উল্লেখ দরকার। প্রথমত, ডারউইন নর-নারীর বুদ্ধিবৃত্তির জন্য শুধুমাত্র যৌন নির্বাচনকেই দায়ী করেন নি। তাঁর মতে, এই পার্থক্যের জন্য দায়ী অংশত যৌন নির্বাচন, অংশত প্রাকৃতিক নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, ডারউইন প্লেটো না কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে সব অন্ধ অনুমানের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় তাঁরই Cousin ফ্রান্সিস গ্যালটন তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সঙ্গীত কাব্য, শিল্প ইত্যাদিতে প্রতিভাবানরা যে অধিকাংশই পুরুষ — এ পরিসংখ্যানের সূত্র গ্যালটনের *Hereditory Genius: An Enquiry into its Laws and Consequences (1869)* পুস্তকটি। একটি চিঠিতে (২৩ ডিসেমবর ১৮৬৯) তিনি স্বইটি সম্পর্কে বলেছেন 'I do not think that I have ever in my life read anything more interseting and original'.

প্রসঙ্গ : আই কিউ / বুদ্ধিবৃত্তি

আমরা জানি, বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধিশীলতা কোনো শুদ্ধ জিন (Gene) নির্ধারিত গুণ নয়' — যদিও এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আজও অব্যাহত। তবুও এই 'আমরা'র দলে এই লেখকও আছে। শ্রীঘোষকেও সবিনয়ে জানাই, আমরা কিন্তু এও জানি যে নারী-পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির কম-বেশির হিসেব কষার কোনো বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই। একজন নারীর সঙ্গে অপর নারীর বা একজন পুরুষের সঙ্গে অপর একজন পুরুষের বুদ্ধিগত পার্থক্য থাকতেও পারে

বা নাও পারে। আবার একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর পার্থক্য থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে সমস্ত নারী বুদ্ধিতে পুরুষ অপেক্ষা দড় — এমন ধারণা ভ্রান্ত। বা তারতম্যের হিসেব কষার বিজ্ঞান - অপবিজ্ঞান, 'infected science' বা পুরুষতান্ত্রিক বিজ্ঞান। সাদা চামড়াদের সঙ্গে কালো বা বাদামি চামড়াদের বুদ্ধিবৃত্তিগত তারতম্য বিচারের গবেষণা একই পর্যায়ে পড়ে। এ বিষয়ে শ্রীঘোষের মন্তব্য বিভ্রান্তিকর।

বিভ্রান্তিকর আই কিউ সম্বন্ধে শ্রীঘোষের বক্তব্যও। 'আই কিউ বিচার 'গভীর' বুদ্ধিবৃত্তির হিসাব দেয় না, বুদ্ধিশীলতার মানসিক স্তরের সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়' — শ্রী ঘোষের এই মন্তব্যে 'গভীর' শব্দটির তাৎপর্য বোঝা দুষ্কর। বা 'বুদ্ধিশীলতার মানসিক স্তর' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সবিনয়ে জানাই, আই কিউ বিচার গভীর বা অগভীর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিরই হিসেব দেয় না।

কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ নাকি আই কিউ পরীক্ষায় নারী-পুরুষে পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। আই কিউ অভীক্ষার ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। বিলেতের কার্ল পিয়ার্সন আর আমেরিকার হেনরি গডার্ড থেকে শুরু করে বর্তমান কালের 'The Best Known living British psychologist আইশেংক পর্যন্ত কেউই কিন্তু এই পার্থক্য খোঁজেন নি। আই কিউ পরীক্ষার শ্রেণী বা জাতিগত পার্থক্যই এদের গবেষণার বিষয়। ১৯২৫ থেকে '৬৫ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণায়ও এই তারতম্য ধরা পড়ে নি (*The Development of Sex Defferences*: Eleanor E Maccoby)। বস্তুত পার্থক্য পাওয়ার কথাও নয়। আই কিউ প্রশ্নাবলী ঐ ভাবেই রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে Encylopaedia of Social Sciences-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : Sex Differences in test performances appear to be negligible, as the tests were standardized on girls and boys alike, his result was pherhaps to be expected ?

ভাস্কর বিশ্বাস
দিনহাটা, কোচবিহার।

মতামত

এক বিশ্বরাষ্ট্র ও বিশ্ব সরকার

গত ডিসেমবর '৯১ সংখ্যায় অর্থনীতি প্রসঙ্গে মাননীয় অয়ন মুখার্জীর একটা মূল্যবান মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমুখার্জী তার মতামতে অর্থনীতি ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক পারস্পরিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রাণোচ্ছলভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে ব্যক্তিমালিকানার অর্থনীতি এবং প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামো বজায় রেখে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি এক যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তাব রেখেছিলেন ব্যক্তিগত সম্পদ মালিকানা এবং পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সমষ্টিগত সম্পদ মালিকানা-নির্ভর অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্যে। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর এই প্রস্তাব উদ্ভট ইউটোপীয় মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু বিমূর্ত বাস্তবাদী দর্শন পরিবর্তনবাদ-এর সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এর বাস্তব প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আহরণ, শিকার ও পশুপালন নির্ভর অর্থনীতিতে দেশ বা রাষ্ট্রর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কারণ তখনও মানুষ কোনও উৎপাদন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে যাযাবর অর্থনীতি ও জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হওয়ারও কোন অবকাশ ছিল না। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা আয়ত্তে আসার পর মানুষ কৃষিভূমিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিই রাজনীতির ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনে এবং গড়ে ওঠে আঞ্চলিক রাজ্য, দেশ ও জাতিগুলি। শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর উৎপাদনের পরিমাণ ও গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্যে অর্থনৈতিক এলাকা বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তাই রাজনৈতিক এলাকার বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। পরিণতিতে দেখা যায় আঞ্চলিক রাজ্য বা দেশগুলো যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক বৃহৎ দেশ বা রাষ্ট্রর রূপ নিল। আধুনিক স্বয়ংক্রিয়

ব্যবস্থা উৎপাদনের পরিমাণ ও গতি আরও বৃদ্ধি করার ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য অর্থনৈতিক এলাকা আরও বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তাই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে আমদানি-রপ্তানি নীতি পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গঠন করতে, পরিবর্তনের এই প্রবণতাই একবিংশ শতাব্দীতে এক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অনিবার্য করে তুলবে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য গত ৭ই মে ওয়েস্ট মিনিস্টার কলেজে প্রদত্ত এক ভাষণে সোভিয়েত রাজনীতিবিদ মিখাইল গরবাচভ উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, অপরাধ, অসুস্থতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আধুনিক বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অবস্থান এমন স্তরে উপস্থিত হয়েছে যে আজ কোনো রাষ্ট্রর পক্ষে এককভাবে এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবিলা করা অসম্ভব। তাই তিনি প্রস্তাব রেখেছেন এক বিশ্বরাষ্ট্র ও বিশ্বসরকার গঠনের জন্য।

মিলন মজুমদার
নিমশা, বর্ধমান।

চতুরঙ্গের পরবর্তী সংখ্যায় যেসব লেখা ছাপা হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল :

লাটিম থেকে লাটাই: বিশ্বপথিক কবি ও মনীষী অমিয় চক্রবর্তী শিবনারায়ণ রায়
বর্গাদার প্রসঙ্গ সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ
এক নজরে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং শিল্প বেণু গুহঠাকুরতা
শুতোমের নতুন সংস্করণ অলোক রায়
বিদ্যাসাগরের বাড়ি অমিয়কুমার সামন্ত
ইংরেজি সাহিত্যের কবি শেলির জন্মের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ রচনা।

With best compliments of :

APEEJAY LIMITED
'APEEJAY HOUSE'
15, PARK STREET
CALCUTTA 700 016

TELEX NO. 021 5627
021 5628

PHONE NO. 29 5455
29 5456
29 5457
29 5458